মনোতরী

সংখ্যা ০২

বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি সোসাইটি

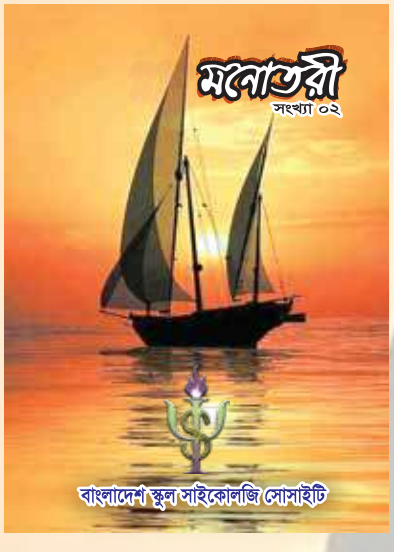

মনোতরী

সংখ্যা ০২

বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি সোসাইটি

মানব সভ্যতার মহীসোপানে এখন চোখ ধাঁধানো সৌরভ আর মানুষের জীবনতরীতে এখন অসীম ব্যস্ততার গৌরব। এই দুই সমমুখী স্রোতের বেগে যথা প্রতিক্রিয়া অনুসারে আরেকটি বিপরীতমুখী কালো স্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে; তার নাম - সম্পর্কের বন্ধ্যাত্ব ।

মনোতরী দ্বিতীয় সংকলন ২০১৯

বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি সোসাইটি

সম্পাদনা পরিষদ : ড. মোঃ কামাল উদ্দিন
মোছাঃ জাকিয়া রহমান
সৈয়দা সারা নাসির
এস এম আবু বকর সিদ্দিকী
জান্নাতুল আদন
আমিনুল ইসলাম
খাদিজা আহসান

গ্রাফিক্স ডিজাইন : মোঃ শাহিনুর ইসলাম

কৃতজ্ঞতা : ড. মোহাম্মদ রওশন আলী
ড. মেহতাব খানম
ড. মাহফুজা খানম
সায়মা ওয়াজেদ হোসাইন
সোহেল রানা
বিপাশা সিংহ
জামিউন নাহার
ফারজানা বেগম
ইসরাত শাহনাজ
সুমাইয়া আলী রাইসা
জান্নাতুল ফেরদৌস
চাইল্ড ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল : ১০ অক্টোবর, ২০১৯

মুদ্রণ : **মামণি প্রিন্টার্স**
২৮৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাটাবন, ঢাকা ১০০০
ই-মেইলঃ mamoniprinter@gmail.com

সৌজন্য মূল্য : **২০০ (দুইশত) টাকা**

শুভেচ্ছাবার্তা

সুস্থ ও সবল মন গঠন করো
যাতে সঠিক সময় সঠিক আচরণ করতে পারো।

মানুষ একটি উন্নতমানের জীব। তার আছে একটা শরীর ও একটা মন। শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য আমরা অনেক কিছু করি, যেমন সুষম খাদ্য গ্রহণ করি, কাজ করি, ব্যায়াম করি ও বিশ্রাম করি। অসুস্থ হলে চিকিৎসা করাই।

মনকে সুস্থ ও সবল রাখতে হলেও আমাদের অনেক কিছু করতে হবে। প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে "মন" কী। আমরা মনোবিজ্ঞানী; মন নিয়ে গবেষণা করি এবং ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের মনের উপর শিক্ষা প্রদান করি। তাই, আমাদের জানতে হবে ও বুঝতে হবে **"মন বলতে আমরা কি বুঝি"**।

আমরা মানুষের আচরণ দেখতে বা প্রত্যক্ষণ করতে পারি, কিন্তু মনকে তা করতে পারি না। তাহলে মন কী? **আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি (I think, therefore I am)**। দার্শনিক ডেকার্টের এই কথা মনের অস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করে। আমরা চিন্তা করতে পারি; ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যা বিচার করতে পারি, আবার অতীতের ঘটনা স্মরণ করতে পারি এবং সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি। আমাদের আচরণের মধ্যে আবেগ আছে। আমরা স্নেহ করি, ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি; আবার ঘৃণা করি ও রাগও করি। এগুলি হলো আচরণের গুণাগুণ। এগুলিই হলো মনের কার্যাবলী। আর মনের কার্যাবলীর মধ্যেই আছে মনের অস্তিত্ব। মনের আর একটি দিক হলো মানুষের ইচ্ছাশক্তি (will power)। মানুষ ইচ্ছা করতে পারে কোন কাজ সে করবে, আর কোন কাজ সে করবে না।

মানুষের মন সুস্থ ও সবল হলে মন উন্নত হয়। আর মানুষের মন উন্নত হলে মানুষের বুদ্ধি প্রখর হয় এবং জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা বাড়ে। মানুষ উন্নত মনের অধিকারী হলে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যা বিচার করবার ক্ষমতা বাড়ে। মানুষ তখন সকল বিষয় বিবেচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

অতএব, মন হলো মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা যার সাহায্যে মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

এখন দেখবো আমরা কিভাবে আমাদের **মনকে সুস্থ ও সবল** করতে পারি। সুস্থ ও সবল শরীরের জন্য যেমন সুষম খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন, তেমনি সুস্থ ও সবল মনের জন্য মনের খোরাক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন আছে। মনের খোরাক কোনগুলি? শৈশবে পিতা-মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের কাছ থেকে আদর-যত্ন, স্নেহ ও ভালোবাসা শিশুর মনকে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন। এরপর হলো শিক্ষার ভূমিকা। সুশিক্ষা ও মানসম্মত শিক্ষা মানুষের মনকে শক্তিশালী করে তোলে। ন্যায়সম্মত পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবহারও মানুষের মনকে সতেজ ও সবল করে তোলে। আর মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য মানসিক চিকিৎসারও সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্য যেমন একজন ব্যক্তির নিজের উপর নির্ভর করে, তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যও একজন ব্যক্তির নিজের উপর নির্ভর করে। একজন মানুষকে তার জৈবিক চাহিদা যেমন সঠিক ও ন্যায়সঙ্গতভাবে পূরণ করতে হবে, তার মানসিক চাহিদাও তেমনি সঠিক ও ন্যায়সঙ্গতভাবে পূরণ করতে হবে। আর মানসিকভাবে অসুস্থ হলে তার মানসিক চিকিৎসাও করতে হবে। ভালো মন গড়তে হলে ভালো কাজ করতে হবে যাতে তার সুপার-ইগো (যাকে কোরআনিক ভাষায় নাফ্‌সে মুতমাইন্না বলে) শক্তিশালী হয়।

ড. মোহাম্মদ রওশন আলী
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকের কথা

মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তা চেতনায় অগ্রসর একটি জাতি দেশকে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নতুন প্রজন্মের মাঝে এক দিকে যেমন জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করতে হবে তেমনি তাদের মধ্যে মূল্যবোধ, সততা, সমাজ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা আর দেশপ্রেম জাগ্রত করতে হবে। মানসম্মত, আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাই পারে আমাদের নতুন প্রজন্মকে উন্নত সমৃদ্ধ সৃজনশীল বাংলাদেশ তৈরির হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে। আর তাই দেশের সকল শিশুর জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা একটি মৌলিক বিষয়। স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে গেলেও বিগত এক দশকে দেশের সর্বস্তরের শিক্ষার অগ্রগতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান যেমন, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, নারী শিক্ষার প্রসার, প্রশ্ন ফাঁস রোধ, পরীক্ষায় নকল বন্ধ করা, বছরের শুরুতেই বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণ ইত্যাদি সম্ভব হয়েছে যা বিশ্বের বহু দেশের কাছে অনুকরণীয়।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)-তে শিক্ষাকে ৪র্থ লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকারসহ বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটনা আজ আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশে কম বয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক উপযোজনে সমস্যা, ইন্টারনেট আসক্তি, নৈতিক অবক্ষয়, হতাশা, বিষণ্নতা, আত্মহত্যার চিন্তা, চেষ্টা ও সংঘটনসহ নানান সমস্যা উদ্বেগজনক হারে বেড়েই চলেছে। ছাত্র-শিক্ষক, শিক্ষক-অভিভাবক এবং মা-বাবা ও সন্তানের মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরিতে সাহায্য করার মাধ্যমে এ ধরনের সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণে স্কুল সাইকোলজিস্ট মুখ্য ভুমিকা পালন করতে পারেন। শিশুরা সুশিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেন তাদের পরিপূর্ণ মানসিক, সামাজিক, আবেগিক, আচরণিক ও নৈতিক চরিত্রের বিকাশ ঘটে তা নিশ্চিত করতে একজন স্কুল সাইকোলজিস্ট শিক্ষক, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশাজীবীদের সাথে একযোগে কাজ করে থাকেন। মনোতরী স্কুল সাইকোলজির মুখপত্র হিসেবে এই বছর দ্বিতীয় বারের মত আত্মপ্রকাশ করছে। মনোতরীর নিবন্ধগুলো স্কুল সাইকোলজির ব্যাপ্তি, উপযোগিতা এবং প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে আরও নিবিড়ভাবে জানতে সাহায্য করবে।

এবারের প্রকাশনাটি সুন্দরভাবে আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করতে সম্পাদনা পরিষদ, লেখক, মুদ্রণ সংস্থা, প্রচ্ছদ শিল্পীসহ স্কুল সাইকোলজি পরিবারের সকলে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। তাদের ভালবাসা এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা ছাড়া মনোতরী প্রকাশনা সম্ভব হত না। সকলের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মনোতরী ভেসে চলুক জীবন-নদী জলে, ছুটে চলুক আপন বেগে স্বীয় শক্তিবলে, স্বপ্নজয়ের পথে।

ড. মোঃ কামাল উদ্দিন
অধ্যাপক
মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপ-সম্পাদকের কথা

প্রিয় পাঠক,

শুভেচ্ছা নিন।

শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সাহিত্য ভাবনা ও স্বকীয় সংস্কৃতির চর্চা সুস্থ জাতির পরিচায়ক। সাহিত্য জীবনকে করে তোলে সুন্দর ও সাবলীল। মানুষকে নিয়ে যায় সত্য, ন্যায়, কল্যাণ ও সৌন্দর্যের দিকে। সাহিত্যের উপযোগিতা চিন্তা-চেতনা, মেধা-মননকে বিকশিত করে। জাগিয়ে তোলে ভিতর থেকে তার মনুষ্যত্ব, দেশপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ। জীবন ও জগতের পাঠ গ্রহণের উপায় হিসেবে সাহিত্য চর্চা স্বীকৃত যুগ যুগ ধরে। বিভিন্ন বয়সী শিক্ষার্থীদের শেখার চাহিদা পূরণের পাশাপাশি তাদের শারীরিক, মানসিক, আচরণগত ও সামাজিক বিকাশ তথা তাদের পরিপূর্ণ বিকাশই যখন স্কুল মনোবিজ্ঞানীদের মূল লক্ষ্য তখন এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে শিক্ষার সাথে সাহিত্যের মেলবন্ধন একান্ত প্রয়োজন। আর এই লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি সোসাইটি' এর পক্ষ হতে গত বছরের মত এ বছরেও প্রকাশিত হয়েছে মনোতরী (দ্বিতীয় সংখ্যা)। মননশীলতার বিকাশ ও সৃজন উদ্যোগকে দীপিত করতে সৃজনশীল রচনার মাধ্যমে ম্যাগাজিন প্রকাশনার এ ধারা জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করবে বলে আশা রাখছি।

মনোতরী সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার চেষ্টা করেছি। তবুও ভুল-ত্রুটি থাকা অসম্ভব কিছু নয়। তাই পাঠকবৃন্দ অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করছি। সেই সাথে আপনাদের মূল্যবান মতামত, পরামর্শ আমাদেরকে জানাতে পারেন, আমরা তা সাদরে গ্রহণ করার চেষ্টা করবো। মনোতরীর প্রকাশনায় যাঁরা নিরলস সহযোগিতা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা চিরকাল। যাঁরা লেখা পাঠিয়ে সহযোগিতা করছেন সবাইকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও অভিনন্দন। মনোতরী হউক সত্য সুন্দর ও অনাবিল আনন্দের উৎস এই কামনা করছি।

জাকিয়া রহমান
পাবলিকেশন সেক্রেটারি
বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি সোসাইটি

সূচিপত্র

১। প্রসঙ্গ : মনোতরী	ড. আনিসুজ্জামান	০১
২। ভূতের মনস্তত্ত্ব	ড. খন্দকার রেজাউল করিম	০৫
৩। জয়ী হতে হলে সমস্যা নয় সমাধানের দিকে দৃষ্টি দিন	ড. মেহতাব খানম	০৭
৪। বুলিং প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায়	ড. মোঃ কামাল উদ্দিন জারিন তাসনিম দিবা	০৯
৫। রাবীন্দ্রিক সাইকোথেরাপি ও চেতনার প্রবাহ	ড. দেবদুলাল দত্ত রায়	২০
৬। দুখিনী বর্ণপরিচয়ের ইতিকথা	যুবায়ের হাসান	২২
৭। স্কুল সাইকোলজি: সূচনা থেকে বর্তমান	এস এম আবু বকর সিদ্দিকী	২৪
৮। সেলুলার মেমোরি: ব্যক্তিত্ব বিস্ময়	খাদিজা আহসান	২৬
৯। শিক্ষণতত্ত্বের প্রয়োগ	আমিনুল ইসলাম	৩০
১০। দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটের প্রভাব	সায়মা রহমান রথি	৩২
১১। আত্মহত্যা নয়, চাই জীবনের জয়গান	সৈয়দা সারা নাসির	৩৫
১২। কোন কারণ ছাড়াই সবসময় রাগান্বিত?	রওনক জাহান জুই	৪০
১৩। মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ	নূরজাহান খাতুন কেয়া	৪২
১৪। গেম আসক্তি	আদনিন জেবিন ইমি	৪৭
১৫। ভাষা নিয়ে ভাবনা	খাদিজা আহসান	৪৯
১৬। School Psychologists and Mental Health of Children and Youth	Saima Wazed Hossain	৫২

প্রসঙ্গ : মনোতরী

ড. আনিসুজ্জামান

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মানুষের যেমন একটি জড় দেহ আছে, আছে দেহের সাথে সম্পর্কিত অনেক আচার আচরণ; ঠিক তেমনি তার রয়েছে একটি চেতনার জগৎ এবং সে জগতের সাথে সম্পৃক্ত কিছু আচরণ। এ চেতনার অধিকর্তা কে - কী তার প্রকৃতি, এ জাতীয় দার্শনিক আলোচনার গভীরে প্রবেশ না করেও এ সম্পর্কে আমরা আমাদের লোক-ঐতিহ্যে পাওয়া বিশ্বাস ও অনুভূতি এবং তদজাত আচার আচরণের লক্ষ্য নিয়ে কিছু কথা বলতে পারি।

বর্তমানে মনোবিজ্ঞান জীববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত একটি বহু শাখা ও মাত্রা বিশিষ্ট বিস্তারশীল বিজ্ঞান। এটি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অগ্রসর হয় এবং সেভাবে তার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে প্রকল্প নির্ধারণ করতে প্রয়াসী হয়। নানা ধরনের পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও সম্ভাব্যতা বিচার করে তত্ত্ব নির্ধারণ করাও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান শাখার মতো মনোবিজ্ঞানের অন্বিষ্ট।

পাশ্চাত্যে বিভিন্ন ধরনের মনোবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে ইদানিং লোক-মনোবিজ্ঞানের (Folk psychology) প্রতিও কিছু মানুষের আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে। এর পাশাপাশি অনেক নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যেও লোক-সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রতি নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। বলা বাহুল্য, যারা অতি মাত্রায় কথিত বিজ্ঞানমনস্ক অথবা জীবনের রহস্যময় দিকে ঐশী ধর্মের শুধুই আক্ষরিক শিক্ষায় বিশ্বাসী, এ দু'শ্রেণীর লোক-মনোবিজ্ঞান বা বিপুল সংখ্যক মানুষের বিশ্বাস ও কর্মের একটি বিরাট এলাকা, যেখানে তারা অতটা বিচার বিশ্লেষণ না করে, অনেক কিছু ধরে নিয়ে, তাদের জীবনের সরল অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে - তারা এ সব মানুষের এ ধরনের বিশ্বাস ও আচরণকে জ্ঞানচর্চা ও তা প্রয়োগের বিষয় বলে মনে করেনা - তারা এ জ্ঞানশাখাকে এড়িয়ে যায়, অবজ্ঞা করে, এমনকি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য পর্যন্ত করে থাকে। আমরা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এ বৃত্ত থেকে একটু বেরিয়ে এসে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও আচরণকে তাদের স্বগতরূপে - তাদের আপন মহিমায় সব সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনায় রেখেই দুটি কথা বলতে চাই।

বাংলাদেশ, পশ্চিমবাংলা এবং ত্রিপুরা ও বিহারের কিছু এলাকা যেখানে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি অনেক মানুষের জীবনের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত, সেখানে লোক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যাদের বিশ্বাস ও জীবনাচরণের ক্ষেত্রে অনেকটা নিয়ামকের কাজ করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হচ্ছে আউল-বাউলেরা। এ অঞ্চলের অনেক লোক কবি ও দার্শনিক তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতার রহস্যময় দিক উপলব্ধি করা ও তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় নানা ধরনের রূপক, রূপকল্প, উপমা, ইঙ্গিতধর্মী, দ্ব্যর্থ বা বহু অর্থবোধক শব্দসমষ্টি ব্যবহার করে থাকেন। এরূপ একটি শব্দগুচ্ছ হচ্ছে মনোতরী। এখানে জীবন যেন একটি বহতা নদীর মতো, যেখানে সাধারণ মানুষ হচ্ছে নদীপথচারী বা দুর্গম পথের অভিযাত্রী, আর গুরু বা স্রষ্টা হচ্ছেন মাঝি। এ জাতীয় একটি উপলব্ধি এভাবে ব্যক্ত হয়েছে :

মন মাঝি তোর বইঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পারলাম না।
সারাজীবন বাইলাম বৈঠা
তীরের নাগাল পাইলাম না,
মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পারলাম না।

লালন সাহিত্য থেকে এ জাতীয় আরও কয়েকটা উদ্ধৃতি দেই :
কত ভাগ্যের ফলে না জানি,
মন রে, পেয়েছ এই মানব-তরণী
বেয়ে যাও ত্বরায়
তোমার সুধারায়,
যেন ভরা না ডোবে।

অথবা,
দেহের মাঝে নদী আছে
সেই নদীতে নৌকা চলছে
ছয় জনাতে গুণ টানিছে
হাল ধরেছে একজনা ।।

অথবা,
আয় কে যাবি ওপারে
দয়াল চান মোর দিচ্ছেন খেওয়া
অপার সাগরে।

অথবা,
এলাহি আলমিন গো আল্লাহ বাদশাহ আলমপনা তুমি।
ডুবায়ে ভাসাইতে পার
ভাসায়ে কিনার দাও কারো।
রাখো মারো হাত তোমার
তাইতে তোমায় ডাকি আমি।।

আরও,
পরের দ্রব্য পরের নারী
হরণ করো না।
পারে যেতে পারবে না।

আরও,
কোথায় হে দয়াল কাণ্ডারি
এ ভব তরঙ্গে এসে কিনারায় লাগাও তরী।।
তুমি হে করুণা সিন্ধু
অধম জনার বন্ধু
দাও হে আমায় পদারবিন্দু
যাতে তুফান ত্বরিতে পারি।।
পাপী যদি না ত্বরাবে
পতিত পাবন নাম কে লবে
জীবের দ্বারায় ইহাই হবে

নামের ভেরম যাবে তোমারি।।
ডুবাও ভাসাও হাতটি তোমার
এভাবে আর কেউ নেই আমার
লালন বলে দোহাই তোমার
ঐ চরণের ঠাঁই দাও ত্বরি।।

আরও,
আমি একা রইলাম ঘাটে
ভানু সে বসিলেন পাটে
আমি তোমা বিনা ঘোর সংকটে
না দেখি উপায়
পারে লয়ে যাও আমায়
আমি অপার হয়ে বসে আছি
ওহে দয়াময়
পারে লয়ে যাও আমায়
নাহি আমার ভজন সাধন
চিরদিন কু-পথে গমন
নাম শুনেছি পথিক পাবন
তাই তো দেই দোহাই
পারে লয়ে যাও আমায়
অগতির না দিলে গতি
অই নামে রবে অখ্যাতি
ফকির লালন কয় ও কূলের পতি
কে বলবে তোমায়
পারে লয়ে যাও আমায়।

আরও,
কতো ধনীর ভারা যাচ্ছে মারা
পরে নদীর তোড় তুফানে।।
রসিক যারা চতুর তারা
তারাই নদীর ধারা চেনে।
উজান তরী যাচ্ছে বেয়ে
তারাই স্বরূপ সাধন জানে।।

আরও,
এ পারে কে আনিলো
ও পারে কে নেবে বলো
লালন কয় তাঁরে ভোলো
কেন রে করে হেলা।

উদ্ধৃত গীতিমালায় বার বার নদীর প্রসঙ্গ এসেছে, এসেছে এ পাড় থেকে ওপাড়ে যাওয়ার ঐকান্তিক আকুতি অথচ স্বীয় চেষ্টায় লক্ষ্যে পৌঁছানোর চূড়ান্ত অক্ষমতা উপলব্ধি করে, স্রষ্টার কাছে শর্তহীন আত্মসমর্পণ ও তাঁর সাহায্যে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। অন্য কথায়, এ সব গীতিগুচ্ছে জীবনযুদ্ধে নিয়োজিত, ক্লান্ত, পরাজিত নদীপথযাত্রীর অসহায় ঐকান্তিক আত্মসমর্পণের চিত্র ফুটে উঠেছে। জীবনরূপ নদীতে বৈরীরূপ সময় ও পরিস্থিতিতে সত্য ও মোক্ষ সন্ধানী মুক্তিকামী মানুষ তার সীমিত প্রয়াসের মাধ্যমে উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তীরে পৌঁছাতে চেয়েছে; কিন্তু কেবল নিজের চেষ্টায় সে তার সে প্রয়াসে সফল না হওয়ায় জীবন নদী ও তার নিজের মালিক ইচ্ছা ও লীলাময় স্রষ্টার কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। এ জাতীয় মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি ও লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারলেও সে লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনেক কবিতা ও গানে মানব মনের এ চিরন্তন আকুতি ও উপলব্ধি বাঙময় হয়ে উঠেছে। কবিগুরুর লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি দেই :

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণ গগণ ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি -
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

জাতীয় কবির কথায় :

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে
মাঝি পথ, ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছো জোয়ান, হও আগুয়ান, হাকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে
তরী পার।

পরিশেষে, এ কথা বলতে চাই যে, আমাদের আলোচ্য তরী স্পষ্টতই কোনও দৃশ্যগ্রাহ্য তরী নয়। এটি হলো আধ্যাত্মিক তরী, উপলব্ধির তরী, অন্য কথায় মনোতরী।

ভূতের মনস্তত্ত্ব

ড. খন্দকার রেজাউল করিম
ইমেরিটাস প্রফেসর, পদার্থবিদ্যা বিভাগ
ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র

ভূতে আমার বিশ্বাস নেই। অথচ ভূতকে আমি ভয় পাই। ভূতের গল্প শুনে আমার গায়ে দেয় কাঁটা। আমি একজন পদার্থবিদ। ভূতের ভয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমার জানা আছে। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস (hypothalamus) থেকে পিটুইটারি (pituitary) গ্ল্যান্ড হয়ে ভয়ের বৈদ্যুতিক সংকেত এড্রিনাল (adrenal) গ্ল্যান্ডে এসে পৌঁছায়। রক্তে কর্টিসোল (cortisol), এপিনেফ্রিন (epinephrine) জাতীয় হরমোনের জোয়ার আসে, ভয়ের শিহরণ সর্বাঙ্গে ছুটে চলে। এত সব জেনেও ভূতের ভয় তো আমার গেল না! ভূতে বিশ্বাস না থাকলেও ভূতের মনোবিদ্যায় আমার আছে ভীষণ আগ্রহ।

"তুমি কি সেই আগের মতই বোকা আছো?" রবীন্দ্রনাথের বউ মৃনালিনী দেবী স্বামীকে এই প্রশ্নটি করেছিলেন– তবে মরণের পরে ভূত হয়ে। রবীন্দ্রনাথ প্লানচেট (planchette) করতে ভালবাসতেন; মৃত মানুষের আত্মাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা ছিল ঠাকুরবাড়ির লোকদের এক বাতিক।

যক্ষ্মা আর কলেরা রোগের দৌরাত্ম্যে অকালমৃত্যুর কোনো অভাব ছিল না সে যুগে, প্লানচেট ছিল জীবিত এবং মৃতদের মাঝে মত বিনিময়ের এক অভিনব উপায়। ঠাকুর বাড়ির ক্যাশিয়ার কৈলাশ কাকা ছিলেন একজন রসিক ব্যক্তি, মরে ভূত হয়ে গেলেন! মরার পরে তাঁর রসবোধ কি আগের মতই আছে? প্লানচেট করে তাঁর প্রেতাত্মাকে ডাকা হলো। "কৈলাশ কাকা, কেমন আছেন? খুব জানতে ইচ্ছে করছে পরকালে জীবন কেমন করে কাটে?" উত্তর এলো, "যা জানতে জীবন হারালাম, তা এত সস্তায় তোদের বলে দেব? সেটি হচ্ছে না বাপধনেরা!" পরকালের জীবন অজানা রয়ে গেল, তবে কৈলাশ কাকার রসবোধ ভূত হয়েও যে অক্ষুন্ন আছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

ভূত হবার অনেক সুবিধা, কষ্ট করে লেখাপড়া করতে হয় না। ভূতেরা বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফার্সি, সব ভাষা জানে, আলোর চেয়ে দ্রুত গতিতে চলতে পারে, দেয়াল ভেদ করে ঘরে ঢুকে যাকে ইচ্ছে ভয় দেখাতে পারে! জীবনে ভূতের অনেক কাণ্ড-কীর্তির খবর পেয়েছি, সবার সেরা গল্পটি শুনেছি আমার একজন শিক্ষকের কাছে। উনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক; ভূত, প্রেত, ভগবান কিছুই প্রায় বিশ্বাস করেন না। ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি সব বেড়াতে এসেছে, বাড়িতে সারাদিন হুলুস্থুল ধুমধাম কাণ্ড চলছে। ক্যামেরাম্যানকে ডাকা হয়েছে একটা গ্রুপ ফটো তোলার জন্যে। ফটো তোলা হচ্ছে, ক্যামেরাম্যান বারবার সবাইকে নড়াচড়া করতে বারণ করছে। কেউ নড়ছে না তবুও বারবার ক্যামেরাম্যানের একই নালিশ।

অনেকবার চেষ্টার পরে ফটো উঠানো হলো। ফটোর দিকে চেয়ে সবার আক্কেল গুড়ুম, ভয়ে মাথার চুল, গায়ের লোম সব খাড়া, রাতের ঘুম হারাম। ছবিতে দেখা যাচ্ছে নানা-নানী দাদা-দাদীদের পুরাতন মুখ যারা অনেক বছর আগেই মারা গেছেন! গ্রুপ ছবি তোলার খবর কেমন করে যেন মৃতদের দেশে পৌঁছে গেছে, মৃত স্বজনেরা এসেছেন সাধের নাতি নাতনির সাথে ছবি তুলতে! তাই তো এত নড়াচড়া, ঠেলাঠেলি, ভিড়!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক ছাত্রাবাসের এক ঘরে আমরা কয়জন প্লানচেট করতে বসেছি। সামনে ফাইনাল পরীক্ষা, ভূতের কাছে প্রশ্নপত্রের কিছু আভাস যদি মেলে! ভূতেরা নাকি ভূত-ভবিষ্যৎ সব জানে! সামনের টেবিলে বিরাট এক সাদা কাগজ। কাগজের মাঝখানে একটা বৃত্ত আঁকা, সেখানে লেখা আছে সেন্টার। কাগজের চারদিকে ইংরেজি A থেকে Z পর্যন্ত সব বর্ণমালা এবং শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত সব সংখ্যা লেখা আছে। বৃত্তের দুই পাশে লেখা আছে Yes এবং No, বৃত্তের ঠিক মাঝখানে রাখা হয়েছে একটি পয়সা। ঘরের সব আলো নেভানো, শুধু একটা মোমবাতি জ্বলছে টিমটিম করে। আমরা তিনজন তর্জনী দিয়ে ধরে রেখেছি পয়সাটিকে।

ভূত এসে টান দিবে পয়সাটাকে, সেই সাথে কাগজময় ঘুরে বেড়াবে আমাদের আঙ্গুল। একাগ্র দৃষ্টিতে বৃত্তের দিকে চেয়ে সবাই মিলে মন্ত্র পড়া শুরু করলাম : "Any noble soul passing by please come to the center." প্রেতাত্মারা শহুরে বাঙালিদের মত ইংরেজি ভাষা এবং চাটুবাক্য পছন্দ করে!

কিছুক্ষণ পরে পয়সাটা হঠাৎ নড়েচড়ে উঠলো। ভূত এসে গেছে! তবে ভূতটা বিশ্বাসযোগ্য কি না তা আগে যাচাই করে নিতে হবে ।

প্রশ্ন শুরু করলাম : "ধন্যবাদ ভূত ভাই, বলুন তো প্রথম মহাযুদ্ধ কবে হয়েছিল?" পয়সাটার সাথে আমাদের আঙ্গুল এক, নয়, এক, এবং চার ঘুরে আসলো - ১৯১৪।

"এবারে বল দেখি পাশের টেবিলের উপরে যে তাসের বান্ডিল, সেখানে কয়টা তাস আছে?" এবারেও সঠিক উত্তর পাওয়া গেল। এমন ভূতকে বিশ্বাস না করে উপায় কি!

আমাদের ঘরে আরো চারজন বন্ধু এতক্ষণ নীরব দর্শকের ভূমিকায় চুপচাপ বসে ছিল। তাদের একজন প্রশ্ন করলো, "আমি একটি মেয়েকে ভালবাসি, তার নাম কি?" এবারেও ভূতের জবাব নির্ভুল। "মেয়েটি কি আমাকে ভালবাসে ?" পয়সাটা আমাদের আঙ্গুলগুলোকে টেনে নিয়ে গেল No লেখা ঘরে। "মেয়েটির সাথে কি আমার বিয়ে হবে?" আবার উত্তর আসলো "না"। হতাশ বন্ধুটি গালাগালি শুরু করলো ভূতকে, আমাদেরকে। নিমিষে ভূত উধাও!

আমি প্লানচেট বিশ্বাস করি না, হাত লাগিয়েছিলাম শুধুই মজা করার জন্যে। পয়সার উপর আঙ্গুল দিয়ে ভূতকে ডাকাডাকি করতে করতে আঙ্গুলগুলো নিশপিশ করে, নড়াতে ইচ্ছে করে! এভাবেই হয়তো নড়াচড়ার শুরু। আমাদের আঙ্গুলের দরকারই বা কেন? ভূত কেন নিজেই পয়সাটা সরাতে পারে না? রবি ঠাকুর প্লানচেট করে মৃত স্ত্রীর কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন মেয়ে রেনুকার বিয়ে কার সাথে হবে, অসুস্থ মেয়ের বায়ু পরিবর্তন করতে কোথায় যেতে হবে– এই সব। মৃত কবিদের ডেকে কিছু কবিতাও তিনি লিখিয়ে নিয়েছিলেন!

পদার্থবিদ হিসেবে ভূত নিয়ে কি কিছু বলার আছে? "যা তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে বা তোমার বানানো যন্ত্রপাতিতে ধরা পড়ে না, সে সম্পর্কে কিছু বলতে যেও না" এটা এককালে ছিল পদার্থবিদদের মন্ত্র। এ ছাড়া আছে আরেকটি কঠিন শর্ত science is based on repeatable, verifiable observations— বারবার সবার পর্যবেক্ষণ এক হতে হবে। আমি অমাবস্যার রাতে তেঁতুল গাছে ভূত দেখেছি এটা বৈজ্ঞানিক সত্য নয়, যদি সবাই সেটা দেখতে না পায়। ইদানীংকালে কোয়ান্টাম তত্ত্ব পদার্থবিদদের পুরানো মন্ত্রটাকে খানিকটা ঘায়েল করেছে। আগের মত জোর গলায় আর বলতে পারি না "যা যায় না ধরা, তা নেই"।

ভূতে বিশ্বাস নেই, তবুও কেউ যদি আমাকে অমাবস্যার রাতে কোনো হানাবাড়িতে একাকী থাকার আমন্ত্রণ জানায়, আমি সে ডাকে সাড়া দিব না। ভূতে আস্থা নেই, তবুও ভূতের ভয় কেন? এর জন্যে দায়ী কোটি বছরের বিবর্তিত আমার পুরানো এই মানব দেহ এবং তার অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি সমূহ। বেঁচে থাকার জন্যে ভয় পাওয়ার প্রয়োজন আছে। লক্ষ বছর আগে মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে-গুহায় বাস করতো, তখন বাঘ বা সাপ দেখে ভয় পেয়ে না পালালে সে বাঁচবে কি করে? এ যুগেও ভীরুরা বীরদের চেয়ে বেশি দিন বাঁচে, তবে কাপুরুষ হয়ে বেঁচে থাকার প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়ে গেছে।

যে কোনো বিপদের গন্ধ পেলেই আমাদের অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি রক্তে হরমোন ঢালতে থাকে। আমরা ভয় পেয়ে যাই। পালাবো না যুদ্ধ করবো? এই দুটি সম্ভবনার জন্যে আমাদের শরীর প্রস্তুতি নেয়! এ যুগে বনের বাঘ আমাদের তাড়া করে না, অফিসের বস, পাড়ার মাস্তান, পাওনাদার, বাড়িওয়ালা বা কাল্পনিক ভূতের হাতে প্রাণ হারানোর সম্ভাবনা নেই। তবুও এইসব সামান্য কারণে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি আমাদের রক্তে হরমোন ঢেলে আমাদেরকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করে তোলে। এ থেকে শেষে জোটে উচ্চ-রক্ত-চাপ, ডায়াবেটিস এবং আরো হরেক রকম রোগ। আমি ভূত বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমার অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিকে সে কথা বোঝাই কি করে?

জয়ী হতে হলে সমস্যা নয় সমাধানের দিকে দৃষ্টি দিন

ড. মেহতাব খানম
অনারারি অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

একজন ভদ্রলোক থেরাপিস্টের কাছে মানসিক সাহায্য নেয়ার এক পর্যায়ে বললেন, তিনি বারবার তার স্বপ্নের মধ্যে একটি ডেস্কের উপস্থিতি লক্ষ্য করছেন। তার কথা শোনার পর থেরাপিস্ট বললেন, তুমি নিজেকে একটি ডেস্ক হিসেবে ভাবতে চেষ্টা করো তো। থেরাপিস্টের কথা শুনে ভদ্রলোক বেশ বিরক্ত হলেন। ব্যাপারটি তার কাছে রীতিমতো হাস্যকর বলে মনে হলো। পরবর্তী সময়ে তাকে অনেকভাবে উৎসাহিত করার পর কিছুটা বাধ্য হয়েই তিনি বলতে শুরু করলেন, "ঠিক আছে আমি একটি মস্ত বড় ডেস্ক। আমার ওপর অনেক জিনিস রাখা হয়েছে। লোকজন আমার ওপর স্তূপাকারে বিভিন্ন বই, ফাইল, ম্যাগাজিন রাখছে। তারা আমার ওপর কাগজ রেখে কলম দিয়ে লিখছে। মাঝে মাঝে আমার গায়ে কলমের খোঁচা লাগছে। কখনো আমার ওপর কিলঘুষি পড়ছে। ইস্! ওরা আমাকে যেমন খুশি তেমনভাবে ব্যবহার করছে কিন্তু আমার নড়াচড়ার শক্তি নেই।" এ পর্যন্ত বলার পর ভদ্রলোক হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, আসলে এই ডেস্কটি তো আমিই, আমাকে তো সারাক্ষণ সবাই ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছে, অথচ তবু আমি কোনো উদ্যোগ না নিয়ে অসহায়ভাবে একটি জায়গাতেই চুপচাপ বসে রয়েছি। আমাকে অবশ্যই একটি কিছু করতে হবে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য।

সাইকোথেরাপির সৌন্দর্য আসলে এই জায়গাটিতেই যে, এর মাধ্যমে মানুষের আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করতে সাহায্য করা হয়। এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যা আর কারো মধ্যেই নেই। জীবনে জয়ী হওয়ার সব সম্ভাবনাই তার মধ্যে নিহিত থাকে। সবাই তাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে সবকিছু দেখে, শোনে, স্পর্শ করে এবং তার স্বাদ গ্রহণ করে। প্রত্যেকের মধ্যেই যেমন কিছু না কিছু প্রতিভা ও দক্ষতা রয়েছে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসুবিধাও রয়েছে। মানুষ তার নিজের জগতে চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা ও সচেতনতা কাজে লাগিয়ে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে জয়ী হওয়ার ক্ষমতা রাখে। আমরা যখন কোনো একটি মানুষকে জয়ী বলি, এর অর্থ এটি নয় যে, সে অন্যদের হারিয়ে দেয়ার জন্য কিছু করছে। একজন জয়ী মানুষ হচ্ছে সেই মানুষটি, যে একজন ব্যক্তি হিসেবে এবং সমাজের একজন সদস্য হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য, সমমর্মী, খাঁটি ও সৎ। এই ব্যক্তিটি বলতে পারে, সে নিজের কাজে কী প্রত্যাশা করে। আবার অন্যরা তার কাছে কী প্রত্যাশা করছে সেটিও সে মোটামুটি সঠিকভাবে বলতে পারে। সমাজের খুব অল্পসংখ্যক মানুষই জীবনে একশ ভাগ জয়ী বা একশ ভাগ পরাজিত হয়। কেউ যখন জয়ী হওয়ার রাস্তায় একবার যাত্রা শুরু করে, তখন তার আরো সামনে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। যদিও সবার মধ্যেই জয়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবু কেউ কেউ অত্যন্ত নির্ভরশীল হয়ে অসহায়ভাবে জীবন কাটায়। তারা অন্যের দ্বারা ডেস্কের মতো ব্যবহৃত হয়, কষ্ট পেলেও কিছু বলতে পারে না এবং উদ্যম ও সাহসের সাথে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। এমনকি তারা তাদের দায়িত্বগুলো সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন থাকে না।

তবে এটিও ঠিক যে, সাফল্য বা জয় কারো জীবনে হঠাৎ করে আসে না। আমরা কী ধরনের মনোভাব নিয়ে চলছি, অর্থাৎ জীবনে চলার পথে কোন জিনিসগুলো বেছে নিচ্ছি সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। একদিন একজন পাদ্রি রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় একটি অনিন্দ্যসুন্দর খামার দেখে থেমে গেলেন। সমস্ত জায়গা জুড়ে ঝলমলে ফসল দেখে তার দু'চোখ জুড়িয়ে গেল। যে কৃষক সেখানে কাজ করছিলেন তিনি পাদ্রিকে দেখে এগিয়ে এলেন। পাদ্রি তাকে বললেন, সৃষ্টিকর্তা তোমাকে এমন সুন্দর একটি খামার উপহার দিয়েছেন, তোমার সে জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অত্যন্ত পরিশ্রমী ও সাহসী কৃষক মৃদু হেসে বললেন, হ্যাঁ আমি সব সময় সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তবে আমি মনে করি যে, এই জায়গাটি যখন আমার ছিল না তখন একবার আপনি এসে এখানকার অবস্থা দেখে গেলে ভালো হতো।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের শুধু ভাগ্য বা সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। জীবনে কী কী সুযোগ রয়েছে এবং আমার পক্ষে কী কী করা সম্ভব, সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আমরা কী চাই তার ওপর সব সময় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব, যা চাই না তা যদি কখনো ঘটেও যায় তাহলে সেগুলোর ওপর গুরুত্ব কমিয়ে রাখতে হবে। কারো কাছে জয়ী হওয়ার অর্থ হচ্ছে প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হওয়া। কারো কাছে হচ্ছে পরিচিতি, সুস্বাস্থ্য, সুখ, আনন্দ, সন্তুষ্টি ও মনের শান্তি। আর্ল নাইটিঙ্গেলের মতে, জয় হচ্ছে একটি কাম্য লক্ষ্যের দিকে অভ্যন্তরীণ ও কাঙ্খিত পরিবর্তনের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া। এটি হচ্ছে এক ধরনের দীর্ঘ যাত্রা এবং যাত্রাপথে ছোট ছোট লক্ষ্য অর্জনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিকে প্রসারিত করা। বাইরের কোনো শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়, নিজস্ব চিন্তাধারার ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং সঠিক মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমাদের চলার পথ আমরাই কন্টকমুক্ত করতে পারি, যাতে করে জীবনে অর্থপূর্ণতা আসে এবং কখনো আমরা শূণ্যতার অনুভূতিতে নিমজ্জিত হয়ে না যাই। বাইরে থেকে জয়ী বা সফল মনে হওয়া অনেক মানুষই কিন্তু মনে মনে শূণ্যতার হাহাকার নিয়ে বেঁচে থাকেন। কাজেই সত্যিকার জয়ের সাথে সন্তুষ্টি খুব জরুরী। এ ছাড়া জীবন জয়ী হওয়া বলতে কিন্তু এটিও বোঝায় না যে, আশপাশের সব মানুষই তাদের গ্রহণ করে নেবে। অনেকেই সফল হওয়া মানুষের সমালোচনা করতে পারে এবং সেই অধিকারটুকু অন্যদের দিতে হবে।

যারা সব কিছু খুব বেশি নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করেন, তাদের চেয়ে বরং যারা বাস্তবমুখী হয়ে নিজের গণ্ডি বুঝে সবটুকু প্রচেষ্টা ঢেলে দেন তারাই জীবনে উন্নতি করেন বেশি। কোনো কাজ মনের মতো না হলে সেটি নিয়ে বসে না থেকে ভবিষ্যতে কীভাবে তা আরো ভালো করা সম্ভব সেটি নিয়ে ভাবাটাই মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশি ভালো। জীবনে চলার পথে সমস্যা থাকবেই, তবে সেই সাথে সমাধানও অনেক রয়েছে। আমরা যদি সমাধানের উপায়গুলোর দিকে বেশি করে তাকাই, অর্থাৎ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যা যা করা সম্ভব সবগুলো উপায় নিয়ে ভাবি এবং তা বাস্তবায়ন করি, তাহলে জয়ের সম্ভাবনার সাথে আমাদের আত্মমর্যাদাবোধও বেড়ে যাবে।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি সফল মানুষেরও অনেকগুলো ব্যর্থতার ইতিহাস রয়েছে। আমরা একটি মানুষের অভিজ্ঞতায় দেখতে পাই যে, তিনি ২১ বছর বয়সে ব্যবসার কাজে ব্যর্থ হয়েছিলেন; কংগ্রেসের নির্বাচনে হেরেছিলেন ২২ বছর বয়সে; ২৭ বছর বয়সে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে বিষণ্নতায় ভুগেছেন; ৩৪ বছর বয়সে কংগ্রেসের নির্বাচনে হেরেছেন; ৪৫ বছর বয়সে ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রতিযোগিতায় অনেক চেষ্টা করেও জিততে পারেননি; আবার একবার ৪৯ বছর বয়সে সিনেটর হতে ব্যর্থ হয়েছেন; শেষ পর্যন্ত ৫২ বছর বয়সে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। আর তিনি হলেন আব্রাহাম লিংকন। আমরাও ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকব না। কখনো পড়ে গেলেও আবার উঠে দাঁড়িয়ে নতুন করে পথ চলার জন্য তৈরি হব। চলুন, সবাই মিলে শপথ করি, কোনো অবস্থাতেই আমরা কাউকে আমাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিতে দেব না। সবার ভেতরই যে কিছু না কিছু প্রতিভা রয়েছে এই বিশ্বাসকে পুঁজি করে দৃঢ়তার সাথে সমস্যার পাহাড়গুলোকে একে একে পদদলিত করে, সঠিক সমাধানটি খুঁজে নিয়ে জয়ের মুকুটটি পরে জীবনকে আরো অর্থপূর্ণ করে তুলি।

বুলিং প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায়

ড. মোঃ কামাল উদ্দিন
প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, মাস্টার্স ইন স্কুল সাইকোলজি
অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জারিন তাসনিম দিবা
মাস্টার্স (স্কুল সাইকোলজি, ৪র্থ ব্যাচ)
মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বুলিং হলো এক ধরনের মৌখিক, মানসিক বা শারীরিক পীড়ন। ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কোন একজনকে বারবার বিভিন্নভাবে ভয় দেখানো বা আক্রমণ করা এবং ইচ্ছাকৃত এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এক বা একদল শিক্ষার্থী দ্বারা দুর্বল শিক্ষার্থী প্রতিপক্ষের উপর হিংসাত্মক আচরণই হলো বুলিং। সেটা হতে পারে ব্যঙ্গ করে নাম ধরে ডাকা, বদনাম করা, লাথি মারা, বিভিন্ন ধরনের কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি করা বা উত্যক্ত করা। এমনকি অবহেলা বা এড়িয়ে চলে মানসিক চাপ দেয়াটাও এক ধরনের বুলিং। এক্ষেত্রে দুর্বল কাউকেই বেছে নেয় বুলিংকারী। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে নিজেদের জাহির করার সাথে সাথে ভিক্টিমকে হাসির পাত্র হিসেবে উপস্থাপন করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য বা কারণ। স্কুল-কলেজ সহপাঠীদের মধ্যে এই বুলিং বিষয়টি ঘটে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে একজন, আবার অনেক ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন মিলে একজনকে বুলিং করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি ন্যাশনাল সার্ভে অনুসারে, স্কুল জীবনে কোনো না কোনো সময়ে ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীই বুলিংয়ের শিকার হয়। এর ফলে তাদের শিক্ষা জীবনে সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যেসব শিক্ষার্থী এর শিকার হয়, তাদের মধ্যে বিষণ্নতা, ভীতসন্ত্রস্ততা, খিটখিটে মেজাজ এবং নিজেকে হেয় করে দেখার প্রবণতা তৈরি হয়। এই বুলিং প্রতিরোধ না করলে সমাজে গঠনমূলক নেতৃত্ব ও সুনাগরিকের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই আপনার শিশুটি বুলিংয়ের শিকার হচ্ছে কি-না বা কাউকে বুলিং করছে কি-না, দু'দিকেই সজাগ থাকা প্রয়োজন।

বুলিং আচরণের ধরণ

কোন কোন আচরণ আমরা বুলিং এর মধ্যে ফেলবো আর কোনগুলোকে ফেলবো না সেসম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা জরুরি-

- কারো পেছনে তার সম্পর্কে খারাপ কথা বলা। সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতেও হতে পারে আবার তার পরিচিত সার্কেলেও হতে পারে।
- উত্যক্ত করা, নাম বিকৃত করে ডাকা বা মজা নেওয়া। কারো প্রতি রূঢ় আচরণ করা।
- কারো সম্পর্কে মিথ্যা গুজব ছড়ানো।
- শারীরিকভাবে কাউকে আঘাত করা। যেমন- লাথি দেওয়া, ল্যাং মারা, ধাক্কা দেওয়া ইত্যাদি।
- কাউকে সবাই মিলে একঘরে করে দেওয়া।
- যৌন হয়রানি, বর্ণ কিংবা ধর্মের কারণে হয়রানি করা।
- সামাজিকভাবে কাউকে হেয় করা।
- হুমকি দেওয়া বা ভয় দেখানো।
- জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেওয়া, টিফিন জোর করে খেয়ে ফেলা, টাকা দাবি করা, যা বলবে তাই করতে হবে এমন মনোভাব প্রদর্শন করা।

এছাড়া আরেকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে কিছু আচরণ আছে যেগুলো বুলিং এর মধ্যে পরে না । যেমন-

- এমন কিছু আচরণ যেগুলো সমাজে গ্রহণযোগ্য নয় কিংবা সমাজের অন্য সদস্যদের জন্য ক্ষতিকর, সেগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলা কিংবা প্রতিবাদ করা বুলিং এর মধ্যে পড়ে না।
- কারো এমন কোন আচরণ যা ব্যক্তি বিশেষে বিরক্তিকর, সেসব কাজে বাঁধা দেওয়াও বুলিং এর অর্ন্তভূক্ত নয়।
- যখন দুইজন মারামারিতে অংশগ্রহণ করবে সেখানে যদি ক্ষমতার অসামঞ্জস্য না থাকে তাহলে তা বুলিং না।

উপরের উদাহরণ থেকে আমরা একটা বিষয় বুঝতে পারি সেটা হলো বুলিং এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলো যখন একটা আচরণের মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে তখনই সেই আচরণকে আমরা বুলিং এর মধ্যে ফেলতে পারি। সেগুলো হল-

- বুলিং এর ক্ষেত্রে ক্ষমতার অসমতা থাকে। অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের ওপর তাদের থেকে শক্তিশালী শিশুরা ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য বুলি করে থাকে।
- কোন আচরণ যখন শত্রুতাপূর্ণ হয় কিংবা সেই আচরণের ফলে অন্য ব্যক্তি কষ্ট পায় সেই আচরণগুলো বুলিং এর মধ্যে পরে।
- বুলিং এর ক্ষেত্রে আরেকটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা হল, এই আচরণগুলো বার বার ঘটতে দেখা যায়।

বুলিং এর কারণ

বুলিং এর কারণ জানার পূর্বে আমাদের একটা বিষয় বুঝতে হবে তা হলো, যে বুলিং করে (বুলি) আর যে বুলিং এর শিকার হয় (বুলিড বা ভিক্টিম) দুইজনের 'life space' আলাদা। এজন্য আপাতদৃষ্টিতে আমরা ধরে নিতে পারি দুইজনের এই আচরণের পিছনে তাদের নিজস্ব কারণ রয়েছে যা আমাদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য বুলি এবং বুলিড দুইজনকেই সাহায্য করে। সাধারণত যে ডিরেকশনে এই প্রসেসটা হয় সেদিক থেকেই বোঝার চেষ্টা করবো। আমাদের একটি সহজাত ধারণা আছে তা হলো কারো ধর্ম, বর্ণ, গায়ের রঙ, চেহারার সৌন্দর্য অথবা কারো ফ্যাশন সেন্স ইত্যাদি বুলিং এর পিছনের প্রধান কারণ। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে এগুলো প্রধান কারণ না। কিছু কারণ হল-

- ছেলে মেয়ে সবার মাঝেই বুলিং দেখা যায়, তবে ছেলেদের মধ্যে একটু বেশি দেখা যায় আর তার কারণ হল ছেলেরা অন্যদের কাছে নিজেকে জাহির করার একটা মাধ্যম হিসাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্রদের ওপর ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ খাটাতে চায়। আর মেয়েদের কারণ অনেকটাই আবেগিক ।
- জীবনে আমরা সবাই কম বেশি মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে যাই। আমরা কেউ কেউ সেটাকে ইতিবাচকভাবে মোকাবেলা করতে পারি আবার কেউ কেউ এটার সাথে মানিয়ে নিতে না পেরে অন্যের ওপর দিয়ে আমাদের এই খারাপ অনুভূতিগুলো চাপিয়ে দেই।
- আমাদের সমাজে ছেলেদের ব্যাপারে একটা প্রতিষ্ঠিত ধারণা হল ছেলে মানুষ হবে রাফ এন্ড টাফ। যে যত আগ্রাসী সে তত দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। অন্যদিকে কোন ছেলে একটু নরম সুরে কথা বললে কিংবা একটু বেশি আবেগী হলে তাকে নিয়ে অন্যরা হাসাহাসি শুরু করে।
- অনেকে নিজের কোন অপূর্ণতা দূর করতেও অন্যকে ছোট দেখানোর চেষ্টা করে।
- মাঝে মাঝে এমন দেখা যায় কোন শিশু ছোটবেলায় বুলিং এর শিকার হলে বড় হলে নিজেই অন্য কাউকে বুলি করে।
- সাধারণত যেসব শিশুরা তাদের বাবা মা কিংবা পরিবারের কাছ থেকে ঠিকমত মনোযোগ পায় না তারাই অন্যদের মনোযোগ পাওয়ার জন্য বুলিং এর আশ্রয় নেয়।

বুলিং এর প্রভাব

বুলিং এর ফলে যে বুলিড বা ভিক্টিম সে যেমন মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তেমনি যে বুলিং করে তার উপরও খুব

নেতিবাচক প্রভাব পরে। বুলিংয়ে ভিক্টিম শিক্ষার্থী সাধারণত স্কুলে যেতে চায় না। আমাদের দেশে ভিক্টিম শিশুরা অনেকেই স্কুলে আত্মরক্ষার জন্য ছুরি জাতীয় অস্ত্র নিয়ে আসে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে বুলিংকারীদের আক্রমণ করে। এছাড়াও যে সব শিক্ষার্থী এর শিকার হয়,

- তাদের মধ্যে বিষণ্নতা, ভীতসন্ত্রস্ততা, খিটখিটে মেজাজ এবং নিজেকে হেয় করে দেখার প্রবণতা তৈরি হয়
- তারা ধীরে ধীরে সমাজ বহির্ভূত হয়ে পড়ে
- আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে
- নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতাকেই দোষারোপ করতে শুরু করে সে
- এক পর্যায়ে স্কুল বা কলেজে যেতে তার অনীহা তৈরি হয় বলে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়
- দীর্ঘদিন ধরে এ অবস্থার ভিতর দিয়ে গেলে শিক্ষার্থী অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ হয়, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে, অনিদ্রা দেখা দেয় সেই সাথে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে, যা অনেক সময় মানসিকভাবে অসুস্থ করে ফেলে ভুক্তভোগীকে।

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির শিক্ষক ড. মার্ক ডমবেক এর মতে বিষণ্নতা, অবসাদ, আত্মহত্যাপ্রবণতা, রাগ, প্রচুর দুশ্চিন্তা হলো বুলিং এর শর্টটার্ম ইফেক্ট। এক্ষেত্রে ভুক্তভোগী নিজেকে আলাদা, অপ্রয়োজনীয়, মূল্যহীন মনে করে হীনমন্যতায় ভুগে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এখানে উল্লেখ্য বাংলাদেশের ১৫-২৯ বছর বয়সীদের মৃত্যুর ২য় প্রধান কারণ কিন্তু আত্মহত্যা।

এছাড়া যারা বুলিং করে তাদেরকেও দিনের পর দিন নেতিবাচক আবেগগুলো সাথে মানিয়ে চলতে হয়। সেটা তার জীবনে একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দেখা যায় একটা সময়ের পর গিয়ে তারা মাদকাসক্ত হয়ে পরে। তারা ধীরে ধীরে সমাজ বহির্ভূত হয়ে পড়ে। এছাড়া ডিউক ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের সাইকিয়াট্রি অ্যান্ড বিহ্যাভিরিয়াল সাইন্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক উইলিয়াম কোপল্যান্ডের মতে বুলিংকারীদের ক্ষেত্রে 'Anti Social Personality Disorder' এর হার অন্য যেকোনো গোষ্ঠীর থেকে বেশি। এরা অপরের প্রতি কম সহানুভূতিশীল হওয়ায় নিজেদের সামান্য স্বার্থে কারো ক্ষতি করতে দ্বিধাগ্রস্থ হয় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তারা ভয়ংকর ক্রিমিনাল হয়ে ওঠে।

বুলিং এর প্রকারভেদ

বুলিং সাধারনত চার রকমের হয়।

১। **ভার্বাল বুলিং:** এই ধরনের বুলিংএ বিভিন্ন ধরনের কটু সম্ভাষণে বন্ধুদের ডেকে অপদস্ত করা হয়। এমনকি তার আচার-আচরণ, অক্ষমতা, ধর্ম বা পরিবারের সদস্য সম্বন্ধে কটূক্তি এগুলোও বাদ যায় না। উদাহরণ: কোন শিশু স্কুল থেকে ফিরে প্রায়ই মন খারাপ করে থাকে কারণ ওর বন্ধুরা ওকে তোতলা বলে ক্ষ্যাপায়।

২। **ফিজিকাল বুলিং:** এই ধরনের বুলিং এ শারীরিকভাবে অত্যাচার করা হয়। বারবার তাকে ঘুষি মেরে বা লাথি মেরে তাকে অপদস্ত করা হয়। উদাহরণ: শিশু মাঠে খেলতে যেতে ভয় পায় কারন ওর বন্ধুরা ওকে লাথি মারে, ঠেলে ফেলে দেয় কখনও ওর প্যান্ট টেনে খুলে দিয়ে ওকে অপদস্ত করে।

৩। **রিলেশানাল বুলিং:** এই ধরনের বুলিংএ মানসিক চাপ দেওয়া হয়। বন্ধুদের গ্রুপে কাউকে পুরো বাদ দিয়ে বাকীদের গল্প করা বা তাকে খেলতে বা গল্প করতে না ডাকা এগুলো রিলেশনাল বুলিং। উদাহরণ: বন্ধুরা মাঝে মাঝে খুব খারাপ ব্যবহার করে। অনেক সময়ই ওরা একজনের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়, ওকে খেলতে বা গল্প করতে ডাকে না।

৪। **সাইবার বুলিং:** সাইবার বুলিং ব্যাপারটি ক্রমাগত বেড়ে চলছে আমাদের তথ্য প্রযুক্তির সমাজে। বন্ধুদের মধ্যে কারোর সমন্ধে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে কটু কিছু লিখে বা অশালীন কিছু পোস্ট করে তাকে অপদস্ত করাই হল সাইবার বুলিং।

এছাড়াও আছে -

৫। **সেক্সুয়াল (Sexual) বুলিং:** অপ্রত্যাশিতভাবে শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্পর্শ করা বা করার চেষ্টা করা, ইঙ্গিতবাহী চিহ্ন প্রদর্শন, কয়েকজন মিলে প্যান্ট খুলে দেয়া, বিভিন্ন আপত্তিজনক স্থানে পানি বা রং ঢেলে দেয়া।

৬। **জাতিগত (Racial) বুলিং:** জাত, বর্ণ, গোত্র, ধর্ম, পেশা, গায়ের রঙ নিয়েও বুলিং করা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু অঞ্চলে বা জেলার শিক্ষার্থীরা বেশি ভুক্তভোগী। বাংলাদেশে জন্মসূত্রে নাগরিক বিহারী ছাত্ররাও এক্ষেত্রে ভিক্টিম। অনেক শিশুদের বাসা থেকে বলা হয় অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুদের সাথে মিশলে তাদের ধর্ম পরিবর্তন হয়ে যাবে। এই ভ্রান্ত ধারণা কোমলমতি শিশুরা স্কুলের অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয় ফলে ঐ শিশুটির সাথে কেউ মিশে না।

আমাদের দেশে ছেলেদের ক্ষেত্র শারীরিক (Physical) বুলিং এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে মৌখিক (Verbal), আবেগময় (Emotional) ও সাইবার (Cyber) বুলিংয়ের হার বেশি। অপরদিকে বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলোতে বুলিং এর হার সামগ্রিকভাবে ইংলিশ মিডিয়াম থেকে বেশি। বাংলা মিডিয়াম স্কুলে শারীরিক ও আবেগিক এবং ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোয় মৌখিক, সেক্সুয়াল ও সাইবার বুলিং তুলনামূলক বেশি। বিশেষ করে ৯ম-১০ম শ্রেণিতে সাইবার ও সেক্সুয়াল বুলিংই অধিক।

বুলিং এর বর্তমান চিত্র

২০১৮ সালে ইউনিসেফের এক জরিপে দেখা গেছে, বিশ্বে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন শিশু বুলিং এর শিকার হয়। যাদের বয়স ১৩-১৫ বছর এবং বুলিং এর কারণে প্রতিনিয়ত তাদের শিক্ষা জীবন ভয়ংকরভাবে ব্যাহত হয়ে থাকে। প্রতিদিন প্রায় ১৬০,০০০-র বেশি শিক্ষার্থী স্কুলে যেতে চায় না বুলিং এর ভয়ে। বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের মধ্যে বুলিংয়ের ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটছে। যদিও এ নিয়ে গবেষণা খুবই কম। তাই কত সংখ্যক শিশু এ ধরনের নেতিবাচক আচরণের সম্মুখীন হচ্ছে, তার সঠিক কোনো সংখ্যা পাওয়া যায়নি। ইউনিসেফের ২০১৪ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সী ৩৫ শতাংশ শিশু ৩০ দিনের মধ্যে এক বা একাধিক দিন কোনো না কোনোভাবে বুলিংয়ের শিকার অথবা বুলিংয়ে সম্পৃক্ত ছিল।

আবার টেলিযোগাযোগ কোম্পানি টেলিনর সম্প্রতি বাংলাদেশে প্রায় ১৮৯৬ জন ১২- ১৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থীর ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করে। সেখানে দেখা যায়, ৪৯% স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থী বুলিং এর শিকার হচ্ছে এবং এদের মধ্য ৩৮% শিশু বিষয়টি তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে শেয়ার করে। এবং দিন যত যাচ্ছে এদের মধ্য আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে। বাংলাদেশ চাইল্ড রাইট ফোরাম এর ২০১৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২১৩ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে।

বুলিং এবং সরকারী উদ্যোগ

২০১৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর নবম শ্রেণির ছাত্রী অরিত্রি অধিকারী আত্মহত্যার পর অনেক আলোচনা সমালোচনার প্রেক্ষিতে সরকার এই বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রণীত নীতিমালায় বলা হয়েছে, সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায়ই বুলিংয়ের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বুলিংয়ের শিকার শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসতে চায় না। এতে বিদ্যালয়ের শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাহত হয়, পরিবেশ বিনষ্ট হয়। যদিও স্কুল বুলিং ফৌজদারি অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না। তবে সে রকম কিছু ঘটতে পারে বলে মনে হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আগে থেকেই পুলিশের সাহায্য নেওয়ার কথা নীতিমালায় বলা হয়েছে। বিদ্যালয়ে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যাবে না। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দল-উপদলের সৃষ্টি হয়। বুলি ও ভিকটিম উভয়কে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কাউন্সেলিং করতে হবে। যেন তাদের আচরণে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়।

নীতিমালায় স্কুল বুলিংয়ের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, বিদ্যালয় চলাকালে, শুরুর আগে বা পরে, শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বা বাইরে কোনো শিক্ষার্থীর দ্বারা (এককভাবে বা দলগতভাবে) অন্য কোনো শিক্ষার্থীকে শারীরিকভাবে আঘাত, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, অশালীন বা অপমানজনক নামে ডাকা, অসৌজন্যমূলক আচরণ করা, কোনো বিশেষ শব্দ বারবার ব্যবহার করে উত্যক্ত বা বিরক্ত করা স্কুল বুলিং হিসেবে গণ্য হবে। নীতিমালায় তিন ধরনের বুলিংয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

- এর মধ্যে কাউকে কোনো কিছু দিয়ে আঘাত, চড়-থাপ্পড় দেওয়া, লাথি ও ধাক্কা মারা, থুথু নিক্ষেপ, জিনিসপত্র জোর করে নিয়ে যাওয়া বা ভেঙে ফেলা ও অসৌজন্যমূলক আচরণ শারীরিক বুলিংয়ের পর্যায়ে পড়বে।
- উপহাস করা, খারাপ নামে সম্বোধন ও অশালীন শব্দ ব্যবহার ও হুমকি মৌখিক বুলিং হিসেবে চিহ্নিত হবে।
- এছাড়া সামাজিক স্ট্যাটাস, ধর্মীয় পরিচিতি বা বংশগত অহংবোধ থেকে কোনো শিক্ষার্থীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন, কারো সম্পর্কে গুজব ছড়ানো এবং প্রকাশ্যে অপমান করা হলে তা সামাজিক বুলিং হিসেবে গণ্য হবে।

অন্যদিকে বুলিং প্রতিরোধে বুলিংকারী শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নিলে অভিভাবকরা বিরোধিতা না করে সহযোগিতা করবে। সন্তানকে স্কুলের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। এছাড়া বুলিংয়ের ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষের জিরো টলারেন্স নীতিগ্রহণ, মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার, সচেতনতা সৃষ্টিতে নাটক মঞ্চস্থ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে নিরুৎসাহিত, স্কুলে আইসিটি ডিভাইস আনা নিষিদ্ধ করার কথাও নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে।

বুলিং প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের উপায়

American Psychological Association (APA) এর মতে বুলিং এর বিরুদ্ধে কাজ করতে হলে মা-বাবা, অভিভাবক, স্কুল অথোরিটি, স্কুল স্টাফ অন্যান্য শিক্ষার্থী সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। যেহেতু স্কুল বুলিং শুরুই হয় স্কুল থেকে তাই প্রতিরোধের শুরুটাও এখান থেকে হওয়া উচিৎ। প্রথমেই স্কুল শিক্ষক, পিয়ন, আয়া, স্কুল বাস ড্রাইভার, দারোয়ান অর্থাৎ স্কুলের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এর কুফল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে। পাঠ্যপুস্তকেও তা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। প্রতি ছ'মাসে অন্তত একবার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এ বিষয় থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন করা কিংবা কাউন্সেলিং পরিসেবা রাখা যেতে পারে। যেমন - বুলিংকারীরা সাধারণত প্রত্যক্ষদর্শীদের সামনে ভিক্টিমকে তাদের থেকে দুর্বল দেখতে চায়। ভিক্টিমের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনে ভিক্টিম কষ্ট পাচ্ছে বুঝতে পারলে তারা তা ব্যাপক উৎসাহে আবারো করে। তাই তাদের গুরুত্ব না দিলে তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, এমন ছোট ছোট বিষয়গুলো নিয়ে সেখানে শিশুদের সাথে আলোচনা করা হবে। সেই সাথে টেলিভিশন, রেডিও ও অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে এ বিষয়ে আরো প্রচারণা প্রয়োজন। স্কুলে গ্রুপ এসাইন্টমেন্ট, সাইন্স ফেয়ার ইত্যাদি দলগত কাজগুলোর ফলে শিশুদের ভিতরে বন্ধুত্ব তৈরি হয় যা বুলিং প্রতিরোধে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। একইভাবে বাসাও হতে হবে বুলিং মুক্ত। শিশুদের কোন অবস্থাতেই ক্লাসে কিংবা বাসায় অন্যদের সামনে শাসন করা যাবে না, কারণ তাও একপ্রকার বুলিং। অনেক ক্ষেত্রে বাসায় বেড়াতে আসা আত্নীয়, সাবলেট ভাড়াটিয়া বা কাজের লোকদের সামনে আমরা শিশুদের শাসন করি। অধিকাংশ সময় আমাদের অনুপস্থিতিতে তারা সেগুলো বলে বাচ্চাদের উত্যক্ত করে। বাবা-মাকে বাসায় শিশুদের সাথে আর বন্ধুসুলভ হতে হবে যাতে সে অকপটে সব কথা আপনার সাথে শেয়ার করতে পারে। এছাড়াও সবাইকে আলাদা আলাদা ভূমিকা পালন করতে হবে। যেমন-

স্কুল অথোরিটির ভূমিকা

- স্কুলের যেসব জায়গায় বুলিং হবার সম্ভাবনা থাকে সেসব জায়গা খুঁজে বের করে প্রপার মনিটরিং এর

ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন - খেলার মাঠ, করিডোর, কমনরুম, ক্যাফেটেরিয়া এসব জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থা করতে হবে।

- শিক্ষাথীদের মধ্যে জরিপ চালিয়ে বুলিং সম্পর্কিত তথ্য তাদের কাছ থেকেই বের করার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন- স্কুলে বুলিং হয় কিনা? কোন জায়গাগুলোতে বুলিং বেশি হয়? কারা বুলিং এর শিকার হয়? কারা বুলিং এর সাথে যুক্ত?
- শিক্ষার্থীদের সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করাতে পারি এই অর্থে যে তারা আর কখনো অন্য কাউকে বুলি করবে না, কাউকে বুলিং এর শিকার হতে দেখলে সাথে সাথে প্রতিবাদ করবে, দরকার মনে হলে বড়দের ডেকে নিয়ে আসবে।
- স্কুলের সংশ্লিষ্ট সবার জন্য Conflict Management Training এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- বুলিং প্রতিরোধে একটা সক্রিয় কমিটি গঠন করতে হবে।
- এছাড়া যারা বুলিং প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে তাদের জন্য পুরষ্কারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- কানাডাসহ উন্নত বিশ্বে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির শেষ বুধবার এবং সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার পালিত হয়ে আসছে 'এন্টি বুলিং ডে'। এছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ বুলিং বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে। আমাদের স্কুলগুলোতেও আমরাও সপ্তাহে বা মাসে একদিন 'এন্টি বুলিং ডে' পালন করতে পারি এবং বিভিন্ন এক্টিভিটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে পারি এই বিষয়ে।

শিক্ষকের ভূমিকা

- ক্লাসে কোঅপারেটিভ গ্রুপ ফর্মিং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রুপ-ওয়ার্ক এবং ইনডোর আউটডোর কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সহযোগিতামুলক মনোভাব তৈরী করতে পারলে বুলিং এর হার কমানো সম্ভব।
- শিক্ষকরা ক্লাসে বিভিন্ন রোল পের মাধ্যমে কিংবা সাইকোড্রামা উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে বুলিং এর খারাপ দিক তুলে ধরতে পারেন।
- প্রতি সপ্তাহে টিচারদের সাথে স্টুডেন্টদের মিটিং আবার টিচারদের সাথে অভিভাবকদের মিটিং করার মাধ্যমে একে অন্যের সাথে কমিউনিকেশন করা সম্ভব।
- শিক্ষার্থীদের এংগার এবং বিহেভিয়ার মেনেজমেন্টের ট্রেইনিং দেয়া যেতে পারে।
- আলাদা আলাদাভাবে বুলি এবং ভিক্টিমের সাথে সাক্ষাত করে বুলিং এর পিছনকার কারণ বের করা সম্ভব।

অভিভাবকের ভূমিকা

- কোন শিক্ষার্থী যাতে বুলিং এর শিকার না হয়, সেজন্য বাবা-মায়ের প্রথম দায়িত্ব হলো সন্তানের সাথে তার প্রাত্যহিক জীবন-যাপন নিয়ে খোলামেলা কথা বলে সমস্যা চিহ্নিত করা, তাকে বুলিং সম্পর্কে অবহিত করা এবং মানসিক চাপ কমানোর সাথে সাথে বুলিং মোকাবেলায় সাহায্য করা।
- যারা বুলিংকারী তারা চায় অন্যকে ছোট করতে আর দেখতে চায় তাদের কথার কতটুকু প্রভাব পড়ছে। সুতরাং এদের চুপ করে দেবার প্রথম ধাপ হচ্ছে তাদের অ্যাটেনশন না দেয়া। সন্তানকে বোঝানো যে, তারা তাকে মানসিকভাবে দুর্বল করতে চায়। আর তুমিও তাদের একেবারেই পাত্তা দিবে না এবং বাচ্চার মানসিক ভীত শক্ত করতে সাহায্য করার দায়িত্ব মা-বাবার।
- বাবা-মার উচিৎ সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। আপনার সন্তান তার জীবনের প্রথম বন্ধু হিসেবে যেন আপনাদেরকেই পায়। বন্ধুর মত সবকিছু সহজে শেয়ার করতে পারে, সেইরকম আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলুন। আপনার সন্তান যদি বুলিংয়ের শিকার হয়, সেক্ষেত্রে আপনার প্রথম করণীয় বিষয়

হবে, তাকে এই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি দেয়া।

- বন্ধুরা দল বেঁধে একসাথে থাকলে কেউ বুলিং করার সাহস পাবে না। আর শিশুকে সাহস দিন এক্ষেত্রে ভয় পাবার কিছু নেই। তাকে আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বুলিং এর ঘটনা (যদি থেকে থাকে) এবং এর থেকে কিভাবে বের হয়েছেন সেই অভিজ্ঞতাও শেয়ার করতে পারেন। আর তাকে বলবেন যে সে যেন তার সহপাঠীদের সাথে বুলিং নিয়ে কথা বলে। এটা যে সঠিক আচরণ নয়, সেটা যেন বুঝিয়ে বলে।
- শিশু যদি বুলিং এর ভুক্তভোগী হিসেবে অতিমাত্রায় বিষণ্নতায় ভোগে এবং স্কুলে যেতে অনীহা প্রকাশ করে তবে তাকে অবশ্যই মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে যান এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী চলুন। কখনোই বুলিং সৃষ্ট সমস্যাকে হালকাভাবে নিবেন না। এর ক্ষতিকর প্রভাব আপনার সন্তানের স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা হতে পারে।
- আপনার সন্তান যখন স্কুলে বুলিং-এর শিকার, এবং বুলিংকারী তার ক্লাস টিচার হয় তবে এ ব্যাপারে তার সাথে সরাসরি কথা বলুন। আর তাতে কাজ না হলে, প্রধান শিক্ষক এবং গভর্নিং বডির কাছে এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ করুন। এতে যে আপনার সন্তান মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা তুলে ধরুন।
- শিশু যদি স্কুলে কোনভাবে কারো দ্বারা বুলিং এর শিকার হয়, তবে অবশ্যই তা স্কুল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন। বুলিংকারী যেই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলুন এবং এক্ষেত্রে বুলিং প্রতিরোধে ও সচেতনতা বাড়াতে স্কুলে বিভিন্ন সভা-সেমিনারের আয়োজন করতে বলুন আর এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষক, অভিভাবক, স্টুডেন্ট, স্কুলের স্টাফ সবাইকে বুলিং এর কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
- অপরকে অসম্মান করলে সে ব্যথিত হয় সেটাও তাকে উদাহরণ দিয়ে সন্তানকে বুঝানোর দায়িত্ব অভিভাবকের।
- নৈতিক শিক্ষাগুলো শিশু সাধারনত বাসা থেকে পেয়ে আসে। সে ক্ষেত্রে বাবা-মার দায়িত্ব অনেক।
- প্রত্যেক ধর্ম মানুষকে ভালোর দিকে চালিত করে, সুতরাং ধর্মীয় শিক্ষা জরুরী।

শিক্ষার্থীদের ভূমিকা

- অন্য সহপাঠী যখন বুলিং এর শিকার হবে তখন চুপ করে না থেকে একসাথে প্রতিবাদ করার শিক্ষা দিতে হবে।
- একে অন্যের জন্য সহানুভূতি এবং সহমর্মিতার শিক্ষাও দিতে হবে যাতে তারা খারাপ সময়ে তাদের অন্য দুর্বল বন্ধুদের পাশে থাকে।
- বুলিং হতে দেখলে বড় কাউকে অবগত করার শিক্ষা দিতে হবে।

যে শিশুরা বুলিং করছে তাদের প্রতি বড়দের করণীয়

যে শিশুটি বুলিং করছে তাকে খুব সতর্কভাবে সামলাতে হবে। তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা একেবারেই উচিত হবে না। তার ব্যবহারের পেছনের কারণ খুঁজে বের করা জরুরি। সাথে সাথে তার চাহিদাও বুঝতে হবে। সেক্ষেত্রে কিছু করণীয় হলো:

- প্রথমত, মা বাবাকে বুলিং ব্যাপারটি খুব গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। বাড়ির সব সদস্যরা এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত প্রকাশ না করাই ভালো। শিশু যেনো স্পষ্ট বুঝতে পারে বাড়ির সদস্যরা বন্ধুদের প্রতি তার দুর্ব্যবহার মোটেই মেনে নেয়নি। ফলে সে নিজেকে সংযত করতে বাধ্য। এর জন্য মারা বা বকার প্রয়োজন হয় না। নিজেকে শান্ত অথচ দৃঢ় রাখুন। বেশি কথোপকথন করবেন না শিশুর সাথে। শুধু শান্ত, কঠোর গলায় কথা বলুন ওর সাথে। তার কিছুক্ষণ পরে ওকে কাছে নিয়ে গল্পোচ্ছলে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন।

- শিশুকে টেলিভিশনে ভায়োলেন্স দেখাবেন না। আজকাল বিভিন্ন কার্টুন প্রোগ্রামেও মারপিটের দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। বাচ্চারা এসব থেকে অনেক কিছু অনুকরণ করে এবং স্কুলে দুর্বল বন্ধুদের ওপর বল প্রয়োগ করে। তাই এই ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণে থাকা খুব জরুরি। একই যুক্তি দেওয়া যায় ভিডিও গেম দেখার বা মোবাইলে গেম খেলার ক্ষেত্রেও।
- বাড়িতে দাম্পত্য কলহ যত তীব্র হয় বাচ্চাদের মধ্যে রাগ, ক্ষোভ ততই বাড়ে। তার প্রকাশ ওরা অনেক সময় বাড়ির বাইরে করে। একটি ছোট ছেলে তার কাউন্সিলারকে বলেছিল, বাড়িতে বাবা তার মা কে যেভাবে মারে সেভাবেই ও তার বন্ধুকে মেরেছে। ফলে বোঝাই যাচ্ছে বাবা মা কে কতটা সতর্ক থাকতে হবে দৈনন্দিন জীবনে।
- বিভিন্ন ধরণের সামাজিক স্কিলের ওপর শিশুকে ধারণা দিন। ওকে উপযুক্ত ব্যবহার করা শেখান। শিশু যদি সবার সামনে সুন্দর আচরণ করে ওকে আলাদাভাবে ডেকে প্রশংসা করুন। তাহলে ওর মধ্যে সবার প্রতি ভাল ব্যবহার করার উৎসাহ আরো বাড়বে।
- শিশুকে 'সরি বা দুঃখিত' বলতে শেখান। যদি ওর বুলিং এ কোনো বন্ধু আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহলেও যেনো পরের দিন অবশ্যই স্কুলে গিয়ে তাকে সেই কার্ড দেয়। এতে বাচ্চারা নিজেরও ঠিক বা ভুল কাজ সমন্ধে ধারণা হয়।

স্কুল সাইকোলজিস্ট এর ভূমিকা

স্কুল ভিত্তিক বুলিং প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর ভুমিকা রাখতে পারে স্কুল সাইকলজিস্টরা। সেক্ষেত্রে তাদের একটি সক্রিয় অবস্থান রয়েছে। কারণ শিশুর যথাযথ মানসিক বিকাশের জন্য একটা স্কুল সেটিংসে যা যা দরকার তারা সেটা তাদের সাইকোলজির প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান এবং দক্ষতা দিয়ে বুঝতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। যেহেতু স্কুল সাইকোলজিস্টরা সরাসরি একটা শিশুর সাথে কাজ করতে পারে, আবার তাদের মা-বাবা, স্কুল স্টাফ, টিচার এবং স্কুল অথোরিটির সাথেও সরাসরি কাজ করার সুযোগ রয়েছে; সেহেতু তারাই পারে বুলিং প্রতিরোধ ও প্রতিকারের পথপ্রদর্শক হতে এবং শিশুর বিকাশের জন্য একটি সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ উপহার দিতে। যেসব উপায়ে একজন স্কুল সাইকোলজিস্ট বুলিং প্রতিরোধে কাজ করতে পারে সেগুলো হল-

- একটা শিশুর যথাযথ সামাজিক দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষে স্কুলের মধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নিবে।
- বুলিং এর শিকার হবার পর ভিকটিমের জন্য ততক্ষণাৎ কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করবে যাতে করে সে নিজের মধ্যে গুটিয়ে না যায় কিংবা কোনরকম আত্মক্ষতির চিন্তা না করে।
- যেসব শিশুরা বুলিং করে তাদেরকে যথাযথ এসেসমেন্টের মাধ্যমে সংবেদনশীলতার শিক্ষা দিবে।
- এমন সব কর্মপন্থা অবলম্বন করবে যাতে তা শিশুদের বুলিং আচরণগুলো হ্রাস করে সেগুলোকে ইতিবাচক প্রো-সোশ্যাল আচরণে রূপান্তরিত করতে পারে।
- বুলি এবং ভিক্টিম উভয়ের মা-বাবা, অভিভাবককে যথাযথ পরামর্শ, গাইডলাইন এবং কাউন্সেলিং দিবে যাতে তারা নিজেদের এবং তাদের সন্তানের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

সহ-শিক্ষা কার্যক্রম

বুলিং প্রতিরোধে আরেকটি কার্যকরী উপায় হতে পারে স্কুলে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করা, যেগুলো পুরোপুরি কিংবা কিছুটা তাদের নিয়মিত একাডেমিক কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। যার মাধ্যমে শিশুরা স্বপ্রণোদিত হয়ে বুলিং এর খারাপ দিক সম্পর্কে জানবে এবং এর প্রতিরোধে নিজেদের গড়ে তুলবে।

- ক্লাসরুমে বুলিং সম্পর্কিত চিত্রকল্প শিশুদের সাথে গল্পের মত করে আলোচনা করতে হবে । এক্ষেত্রে তারা নিজ উদ্যোগে বুলিং এর কুফল কিংবা বুলিং এর ফলে কিভাবে অন্য একজন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তার সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পাবে। সেইসাথে বুলিং সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান তারা নিজেরাই বের করতে উদ্যোগী হবে।
- বুলিং সম্পর্কিত সিনেমা, কার্টুন, টিভি সিরিজের মাধ্যমে শিশুদের সামনে বুলিং আচরণগুলো তুলে ধরতে হবে। যাতে করে তারা নিজেরাই এই ব্যাপারে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।
- কর্মশালার মাধ্যমে স্কুলের শিক্ষার্থীদের যথাযথ অনলাইন বিহেভিয়ার সম্পর্কে অবগত করতে হবে যাতে তারা অনলাইনে দায়িত্বশীল আচরণের ব্যাপারে চিন্তাশীল হয় ।
- বুলিং সম্পর্কিত পোস্টার, দেয়ালচিত্র, দেয়ালপত্রিকা শিশুদের দিয়েই নিয়মিতভাবে করাতে হবে যাতে তাদের বুলিং প্রতিরোধে নিজস্ব উদ্ভাবনী চিন্তাধারণা প্রদর্শিত হয় ।
- সাইকো ড্রামা বা রোল প্লের মাধ্যমে বুলিং আচরণগুলোর নেভেটিভ দিক শিশুদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বোঝাতে হবে।

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম

এছাড়াও শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে অংশগ্রহনের মাধ্যমে তাদের বুলিং বিরোধী দৃঢ় মনোভাব গড়ে তোলা সম্ভব। এইধরণের কার্যক্রমগুলো সাধারণত শিক্ষার্থীদের নিয়মিত একাডেমিক কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত না। যদিও এগুলো স্কুল বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই কার্যক্রমগুলো কোন একাডেমিক ক্রেডিট বহন করে না। কিন্তু এগুলো একটা শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিকাশে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে তেমনি তা শিশুর প্রতিভা, আগ্রহ এবং আবেগ বিকাশেও সহায়তা করে। আবার এগুলো শিশুদের সময় পরিচালনা এবং রাগকে সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা কিংবা অন্যদের সাথে মিলেমিশে কাজ করার মতো ব্যবহারিক দক্ষতাও শিখতে সাহায্য করে। পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল-

- স্কুলের বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ক্লাবে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহনে উৎসাহিত করা । যাতে তারা গঠনমূলক কাজে নিজেদের শ্রম এবং মেধাকে কাজে লাগাতে পারে এবং তাদের আগ্রহের জায়গাটা নিজেরাই খুঁজে বের করতে পারে ।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে সংযুক্ত করার মাধ্যমে তাদের ভিতরকার উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে বিকশিত হবার সুযোগ দিতে হবে । যেমন- সাইন্স ফেয়ার আয়োজন ইত্যাদি।
- বিভিন্ন দেশীয় কিংবা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলোতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে তাদের বাস্তব দুনিয়ার সাথে কিভাবে সুস্থ প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হবে সেই শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। যেমন- গণিত অলিম্পিয়াড, ডিবেটিং কম্পিটিশন ইত্যাদি।
- শিশুদের সহমর্মিতার এবং সহানুভূতিশীলতার শিক্ষা দিতে তাদেরকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী কাজে নিযুক্ত হতে উৎসাহিত করতে হবে। যেমন- পথশিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা, শীতার্তদের সাহায্য করা ইত্যাদি।

এছাড়াও খেলাধুলা কিংবা যেসকল কাজে বুলিং এর সম্ভাবনা থাকে সেই কাজগুলো কিভাবে দলগতভাবে করা যায় কাউকে কষ্ট না দিয়ে তা খেলার ছলে শিক্ষার্থীদের বুঝানো সম্ভব।

বুলিং প্রতিরোধে বিশেষায়িত একটি শিক্ষাক্রমের দৃষ্টান্ত: ফিনিক্স কারিকুলাম

'দা ফিনিক্স কারিকুলাম' হচ্ছে একটি স্কুল-ভিত্তিক গ্যাং-সংস্কৃতি প্রতিরোধে একটি ৫০ ঘণ্টা-ব্যাপী বিশেষায়িত

শিক্ষাক্রম, যা শিক্ষার্থীদের স্বদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্যাং-সংস্কৃতি এবং বুলিং আচরণ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে । এই শিক্ষাক্রমে বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষার্থীদের সাথে বুলিং সম্পর্কিত আচরণ, এর প্রতিকার এবং প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিষয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়। সেই সাথে জীবন দক্ষতার (লাইফ স্কিল) বিভিন্ন বিষয়েও শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । ফিনিক্স কারিকুলাম শিক্ষার্থীদের সহিংস আচরণের পেছনে দায়ী রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোকে চিহ্নিত করে এবং সেগুলো প্রশমনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করে। ফিনিক্স কারিকুলাম গ্যাং-সংস্কৃতি প্রতিরোধ এবং প্রতিকার করে দুইটি পদ্ধতিতে:

- দা ফিনিক্স কারিকুলাম বিভিন্ন পর্যায়ের স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করে, যা তাদেরকে গ্যাং-সংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়ার সর্বোচ্চ রিস্ক-ফ্যাক্টরগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করে ।
- এদের মধ্যে যারা তুলনামূলক বেশি ঝুঁকিতে আছে, তাদের জন্য এই কার্যক্রমে রয়েছে বিভিন্ন উৎসের সমন্বয়ে তৈরি একটি বিস্তারিত পদ্ধতি ।

দা ফিনিক্স কারিকুলাম মাদক সেবন, সহিংসতা, বুলিং, গ্যাং এ ঢুকে যাওয়া এবং অন্যান্য অপরাধে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা মানুষদের চিহ্নিত করতে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেয় এবং এ বিষয়গুলোতাদের সামনে তুলে ধরে তাদের দক্ষ করে তোলে। এই দক্ষতার মধ্যে রয়েছে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা মানুষ, স্থান, বস্তু এবং পরিস্থিতি ইত্যাদি চিহ্নিত করতে পারা এবং তাদের এই নতুন দক্ষতার মাধ্যমে এই রিস্ক ফ্যাক্টর-গুলোকে আত্মবিশ্বাসের সাথে মোকাবেলা করতে পারা। এই নতুন দক্ষতাগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে এড়িয়ে চলা, বের হয়ে আসা, বর্জন করা, গ্যাং এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং সহিংসতা প্রতিরোধ করার মতো বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠা। সফলভাবে গ্যাং এ হস্তক্ষেপ এবং তাদের প্রতিরোধ করার জন্য দক্ষতাই একমাত্র উপায়। ফিনিক্স কারিকুলাম সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন রিস্ক-ফ্যাক্টরগুলোর প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্কুলগুলোর গ্যাং-বিরোধী কৌশলগুলোর সাফল্য নির্ভর করে একটি মজবুত সামাজিক নিরাপত্তা জাল (সেইফটি নেট) এর ওপর।

উপসংহার

বন্ধুদের সাথে মজা তো আমরা সবাই করি। কিন্তু সেই মজাটি যখন বন্ধুর জন্য অস্বস্তিকর হয়ে যায় কিংবা সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং এই অপ্রীতিকর ঘটনাটি যখন বন্ধুর আপত্তি সত্ত্বেও বারবার ঘটতে থাকে তখন সেটা সমস্যা হিসাবে দেখা দেয় । একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় বিশ্বের প্রায় ২২% মানুষ যারা বুলিং এর শিকার হয়েছেন তারা বেশ লম্বা সময় ধরে এটির দ্বারা প্রভাবিত হন । কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটি ৫০ বছর পর্যন্ত যেতে পারে। মেয়েদের ক্ষেত্রে শতকরা ৪০ জন এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে শতকরা ২৭ জন শৈশবে বুলিং এর ফলাফল হিসেবে পোস্ট ট্রমাটিক ডিসঅর্ডারের সম্মুখীন হয় । বুলিং এর মানসিক ট্রমা, ডিপ্রেশন কিংবা লো সেলফ এস্টিম এর কারণে সে সুইসাইডের দিকেও এগিয়ে যেতে পারে সাথে ড্রাগ এ্যাডিকশনের দিকেও। যখন সে দেখে সে বুলিড হচ্ছে দেখেও কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না তখন তার ভিতরে ট্রাস্ট ইস্যু গড়ে উঠতে পারে। এ্যাগোরাফোবিয়া কিংবা প্যানিক ডিসঅর্ডারের মত সমস্যার পিছনেরও অন্যতম কারণ এই বুলিং (ডিউক ইউনিভার্সিটি, নর্থ ক্যারোলাইনা)। একজন বুলিং ভিক্টিমকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সাধারণত কাউন্সেলিং কিংবা কথা বলাই সর্বোত্তম পদ্ধতি। একজন প্রফেশনালের সাথে কথা বলে কিংবা অন্যান্য মানুষ যারা কিনা বুলিং এর শিকার হয়েছেন এসব মানুষের সাথে কথা বলে নিজের ভয়কে কাটানো যায়। বুলিং ভিক্টিমরা অনেক সময় বুলিড হওয়ার

জন্য নিজেকে দোষারোপ করে থাকেন। যার কারণ হচ্ছে low self-esteem বা হীনমন্যতা। নিজের মতামতের গুরুত্ব না পাওয়া, সোশ্যাল সার্কেলে যথাযথ মনোযোগ না পাওয়া এর অন্যতম কারণ। এখানে কথা বলার মাধ্যমে ভিক্টিম বুঝতে পারে তার মতামতেরও গুরুত্ব রয়েছে। সে নিজেকে গুরুত্ব দেয়া শেখে। বুলিং এর ফলে যে ভিক্টিম পাবলিকলি কথা বলতে ভয় পায় সে আস্তে আস্তে তার ভয়কে কাটিয়ে উঠে।

এছাড়াও বুলিং প্রতিরোধে স্কুল কর্তৃপক্ষকে সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রত্যাশিত এবং বর্জনীয় আচরণ সম্পর্কে পরিস্কারভাবে ছাত্রছাত্রীদের জানিয়ে দিতে হবে। উত্যক্ত করার প্রভাব এবং তা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে স্কুলের সকল ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের পাশাপাশি অন্যান্য কর্মচারী যেমন, মালি, দারোয়ান, পিয়ন- এদেরকেও বিশেষ শিক্ষা দিতে হবে। ক্লাসে বক্তৃতা, খোলামেলা আলোচনা, বিষয়ভিত্তিক রচনা-নাটিকা-গান প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুদের বুলিং-প্রতিরোধী মনোভাব গড়ে তোলায় যায়। অভিভাবকদেরও এ ব্যাপারে সম্পৃক্ত করতে হবে। এ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ পেলে তা গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যথাযথ ব্যবস্থা বলতে উত্যক্তকারী শিশুকে শাস্তি দেয়া বা স্কুল থেকে বের করে দেয়া নয়, বরং তাকে প্রত্যাশিত আচরণের জন্য শিক্ষা দিয়ে সংশোধিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। বুলিং-এর শিকার শিশুটিকে সহপাঠী, শিক্ষক, স্কুল কর্তৃপক্ষ, পরিবার- সকলের সহযোগিতা করতে হবে। কেউ যেন উত্যক্তকারী হিসেবে গড়ে না ওঠে এ ব্যাপারে বাবা-মাকেও গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে হবে। প্রয়োজনে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর সহায়তা নিতে হবে। সম্ভব হলে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কুল সাইকোলজিস্ট নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

কৃতজ্ঞতা: শিক্ষার্থীবৃন্দ (৪র্থ ব্যাচ, ২০১৮-২০১৯), মাস্টার্স ইন স্কুল সাইকোলজি, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রাবীন্দ্রিক সাইকোথেরাপি ও চেতনার প্রবাহ

ড. দেবদুলাল দত্ত রায়

হেড, সাইকোলজি রিসার্চ ইউনিট
ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কোলকাতা, ইন্ডিয়া

মানসিক সমস্যার প্রধান দুটি কারণ হল- ভ্রান্ত শিক্ষা ও শিক্ষার অক্ষমতা। রাবীন্দ্রিক সাইকোথেরাপি এই সমস্যার সমাধান ঘটায় চেতনার স্তরে পরিবর্তনের মাধ্যমে। সাইকোথেরাপিস্ট সংগীত, নৃত্য, নাটক, কবিতা ও চিত্র সহকারে এই পরিবর্তন সৃষ্টি করেন। সাইকোথেরাপিস্ট চেতনার স্তরগুলি গভীর ভাবে অধ্যাপনা করেন যাতে অপরের চেতনায় প্রবেশ করতে পারেন। রাবীন্দ্রিক সাইকোথেরাপিতে চেতনার কোনো সংকীর্ণতা নেই। কিন্তু ব্যাপ্তি আছে, পূর্ণ স্বাধীনতা আছে মানসিক রোগীর।

রোগী স্বাধীন ভাবে আত্ম চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। থেরাপিস্ট চেতনার তরঙ্গের উদ্বেলতা ও গতি প্রকৃতি অনুধাবন করেন। চেতনার পথের দিশা দেখান সংগীত, কবিতা, নৃত্য, নাটক ও চিত্রের মাধ্যমে। রবীন্দ্রসংগীতে দিশা দেখানোর শক্তি বিদ্যমান। চেতনার গতি প্রকৃতি জানা সহজ হয় চেতনাকে জানার মাধ্যমে। চেতনা পারিপার্শ্বিক বস্তু সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া করাকে চেতনা বলে। চেতনার তিনটি স্তর আছে যথা মূর্ত, রাগ এবং সারস্বত। মূর্তের উপাদান সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ। সংবেদন উদ্দীপনার মাধ্যমে উদ্দীপকের উপস্থিতি নির্দেশ করে।

প্রত্যক্ষণ উদ্দীপকের অর্থ। মূর্ত হল ধূসর বর্ণের। রাগ নানা বর্ণময়। এই স্তরের উপাদান হল আবেগ ও রূপকল্প। রূপকল্পে আবেগ মিশ্রিত হয়। তাই রূপকল্পে নানা বৈচিত্র্য আসে। একাধিক রূপকল্পে সংঘর্ষ হয়। দ্বান্দ্বিক চরম সীমানা সৃষ্টি হয়। মানসিক স্থিরতা বিঘ্নিত হয়, মানব চেতনা ভারসাম্য অনুসন্ধান করে। ধীরে ধীরে সংঘর্ষ কমে আসে। রূপকল্প একীভূত হয়। রূপকল্প সারস্বতে প্রবেশ করে। সারস্বত হল সাদা। সারস্বত স্তরে রূপকল্পের কোনো আলাদা অবস্থান পরিলক্ষিত হয় না। জলে বুদ্বুদ ওঠে আবার জলে মিশে যায়। তখন তাকে পৃথক ভাবে বোঝা যায় না। দ্বান্দ্বিক সত্ত্বার রূপান্তর ঘটে। আবার সেই রূপান্তরে নতুন বুদবুদ ওঠে এবং মিলিয়ে যায়। চলমান জীবনে চেতনা বারংবার আঘাত পায় নতুন চিন্তন দ্বারা। ক্রমশঃ চেতনা পরিবর্তিত হয়। প্রতি স্তরের তরঙ্গ ধারায় বৈচিত্র্য আছে। মূর্ততে নতুনের আবির্ভাব সামান্য আন্দোলিত, রাগে উদ্বেল, সারস্বতে ধীর ও শান্ত। এই কারণে একই বস্তুকে এক একটি স্তরে ভিন্ন রূপে লক্ষ্য করা যায়। আচরণে বিবর্তন আসে। মূর্ততে সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের অবস্থান। রাগে আবেগ ও সারস্বতে একক বা সাদৃশ্যের অবস্থান। তাই বস্তুর দ্বান্দ্বিক রূপ সারস্বতে অদৃশ্য। বস্তুর এই পরিবর্তন আসে একাধিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে। নতুন চিন্তন চেতনার উপর ঊর্ধ্ব, নিম্নগামী ও পার্শ্বচাপ সৃষ্টি করে। এই চাপ থেকেও নতুন চিন্তনের আবির্ভাব ঘটে। একই সময়কালে একাধিক চাপ দ্বিধাগ্রস্ত করে চেতনাকে। অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়। আবার নানা ঘাত প্রতিঘাতে সামঞ্জস্য আসে। এই ভাবে আদি অনন্তকাল ধরে চেতনা পরিবর্তিত হতে থাকে। কিছু কেস স্টাডির মাধ্যমে চেতনার পরিবর্তন উপস্থাপন করা হল। রাবীন্দ্রিক সাইকোথেরাপিতে আমি রবীন্দ্র সংগীত ব্যবহার করে থাকি কারণ এই সংগীত চেতনার তিনটি স্তরে খুব দ্রুত আন্দোলন সৃষ্টি করে। একটি কেস স্টাডি দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। কেস স্টাডি শিক্ষাগত দুশ্চিন্তা নিয়ে একটি ছেলে আমার চেম্বারে আসে। ছেলেটি তখন ক্লাস সিক্সে। সারাদিন বই নিয়ে বসে থাকে। বুঝতে পারে না কেন ওর রেজাল্ট খারাপ হয়। বাবা-মা দিশেহারা। ওর রাগ হয় নিজের প্রতি। সেই রাগের প্রকাশ হঠাৎ অদ্ভুত ভাবে প্রকাশ হল। যে ছেলে মাথা উঁচু করে কথা বলে না সেই কিনা মা আর বাবাকে মারছে। এত সুন্দর আয়না ভেঙ্গে ফেলল। ছেলেটির সাথে কথা বলে ওর শিক্ষাগত দুশ্চিন্তা বুঝতে পারলাম। ওর রবীন্দ্র সংগীত খুব প্রিয়। মায়ের কাছে শেখা। "আমায় একটি গান শোনাবে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। ও গান শুরু করল:-

"যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে- জানি নে জানি নে ॥
সে কি আমার কুঁড়ির কানে কবে কথা গানে গানে,
পরান তাহার নেবে কিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে--
জানি নে, জানি নে ॥
সে কি আপন রঙে ফুল রাঙাবে।
সে কি মর্মে এসে ঘুম ভাঙাবে।
ঘোমটা আমার নতুন পাতার হঠাৎ দোলা পাবে কি তার।
গোপন কথা নেবে জিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে-
জানি নে, জানি নে ॥"

কি মিষ্টি গলা ! মনে হল যেন অনেক দিনের অদেখা কার সাথে ও কথা বলছে। আমিও সেই গানে ডুবে ছিলাম। সেই অদ্ভুত প্রশ্ন মনে এল। জিজ্ঞাসা করলাম যদি বই তোমায় এই প্রশ্ন করে তবে তাকে কি বলবে। একটু থেমে বলল "জানি নে।" এতদিন যা ছিল ভাবনায় আজ তা আমার সামনে প্রতীয়মান। যা শুনলাম তা কি সত্য? যদি সত্য হয় তবে এতক্ষণ ছেলেটি ঐ গানের কোনো চরিত্রের সাথে কি কথা বলেছিল? ছেলেটি চুপ। হঠাৎ বলল- "এবার থেকে আমি ওকে আরও ভাল ভাবে জানব ও বুঝব।" আমি অবাক। এমন কথা কার মুখে? কবি কি স্বয়ং এই কথা বলছেন? তবে কি দুটি চেতনার মিলন হল? অভিভাবকদের জানালাম আমার থেরাপি শেষ। এক সপ্তাহ পর ফোন করতে বললাম। "ডঃ সেদিনের পর থেকে ও একেবারে আলাদা মানুষ।" ফোনের ওপার থেকে নারীকণ্ঠ। বুঝলাম ছেলেটির মা কথা বলছেন। "বুঝলাম না।"

"তারপর থেকে ও লেখে আর পড়ে। আগে লিখত না।" "ভাঙচুর?" "নেই।" তিন মাস পর ওর রেজাল্ট বেরোলো - পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

দুখিনী বর্ণপরিচয়ের ইতিকথা

যুবায়ের হাসান
মুখ্য মহাব্যবস্থাপক, বিটিসিএল
ঢাকা

যুগে যুগে, কালে কালে ঘরের শত্রু বিভীষণ ছিল এবং থাকবেই, এরা নিজেদের ভাষা আর সংস্কৃতির কত প্রকারে ক্ষতি করা যায়, কী কী করলে এর শেকড়বাকড় শুধু নয়, -গোড়াই কাটা পড়ে, সে চেষ্টা করে আদা-জল খেয়েই আর তা করে নিজেদের আখের গোছাতে, পকেট ভরাতে। এই যে আমাদের আধুনিক বাংলা ভাষা আর সংস্কৃতির প্রবাদপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে বাংলার বুকেই এত বড় অসম্মানের ঘটনা ঘটে গেল–সুস্থ বুদ্ধির কোন মানুষ কি তা ভাবতে পেরেছিলেন, কিন্তু তারপরও সেটাই ঘটেছে।

ব্যাপারটা ছোট করে দেখার কিছু নেই। ভেতো স্বপ্নবিলাসী বাঙালির সবকিছু হজম করে নেয়ার প্রবণতার সুযোগ নিয়েই ঘটেছে এই ন্যাক্কারজনক দুর্বৃত্তপনা! কেউ কেউ বলছেন, এটা তো একটা ভাস্কর্যই মাত্র, পর্বত সমান মানুষটার আসল ভাবমূর্তি ভাঙতে ওরা কোনোদিনই পারবে না। সে যাই বলুন না কেন, নিজের মাটিতে বসে এমন কড়া থাপ্পড় হজম করা কোনো কাজের কথা নয়। ভাবতে অবাক লাগে, বাংলার যে অংশে বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের মাপের মানুষেরা একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব (যাকে রেনেসাঁই বলা যায়) ঘটিয়েছিলেন, যার যাত্রা ছিল সুদূরাভিসারী, অযুত সম্ভাবনাময়, সেই জাগরণের ভূমিই আজ ভূমিপুত্রদের উদাসীনতা আর বদলে যাওয়া মানসিকতার কারণে হাতছাড়া হয়ে যেতে বসেছে।

বাংলা কি আর সত্যিকারের বাংলার আদল ফিরে পাবে? তেমন কোনো আলামত কিন্তু চোখে পড়ছে না, বরং দিন যত যাচ্ছে, বছর যত গড়াচ্ছে, অবস্থা আরও খারাপ থেকে খারাপ হচ্ছে। এই যখন দশা, তখন সেই জাগরণের দূতেরা, অভিভাবকেরা কি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন? উত্তর পুরুষ হিসেবে আমাদের কি তাঁদের দায় পরিশোধ করার একটা ব্যাপার ছিল না? ওই বাংলার সেরা বুদ্ধিজীবীদের লেখা নয়, অনেক বছর আগে দেশ পত্রিকায় পাঠকের প্রতিক্রিয়া হিসেবে অজানা লিখিয়েদের লেখা পড়েছিলাম, মনে যা দাগ কেটে রেখে গেছে।

কাজল চট্টোপাধ্যায় আর উত্তম কুমার রায় নামের দু'জন সংস্কৃতি-সচেতন মানুষের লেখাগুলো জোড়া লাগালে নীচের মতো হয়, আজ যা খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে বুকে বাজছে। আপনারাও পড়ে দেখতে পারেন–

" বড়ই উদার এ শহর, কিন্তু মনের অতলে কাজ করে প্রাদেশিক সংকীর্ণতা। কলকাতা প্রাদেশিক সংকীর্ণতা পোষণ করে বলেই বোধহয় মহানগরীর লিঙ্‌গুয়া ফ্রাঙ্কা আজ হিন্দিতে পরিণত হয়েছে। পেটে ক্ষুধার উদ্রেক হলেই ভূ-ভারতের বুভুক্ষু জনগণ এ শহরে ছুটে এসে অবলীলায় ফুটপাত দখল করে নিতে পারে, একবর্ণ বাংলা না শিখেও উচ্চমাধ্যমিক স্তর পার হওয়া যায়, এমনকি রাজ্যের সরকারি চাকরিতেও প্রবেশ করা যায়। মুষ্টিমেয় আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী যখন কলকাতায় বাংলাকে সম্মানজনক স্থানে উন্নীত করতে চান, তখন এ শহরের বেশিরভাগ মানুষ আর যাবতীয় সংবাদপত্র সেই প্রাদেশিক উদ্যোগের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে, অথচ হাওড়া, শিয়ালদা স্টেশনে হিন্দির দাপটে বাংলা নির্দেশিকা নিশ্চিহ্ন হলে, এই উদার ব্রিগেড সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে। ধন্য কলকাতার উদারতা ! নিজ বাসভূমির রাজধানী শহরকে ঠিক কী প্রকারে বহিরাগতদের হাতে তুলে দিতে হয়, সে বিষয়ে গবেষণা করতে হলে বিশ্ববাসীকে বারে বারে এই কলকাতাতেই ফিরে আসতে হবে।

বহুভাষিতা, বহু সংস্কৃতি অবশ্যই কলকাতার অহংকার হওয়া উচিত, কিন্তু তা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার মূল্যে নয়। নন্দন আকাদেমি, রবীন্দ্র সদনের ছোট্ট চত্বরের বাইরে যে বিশাল কলকাতাটা পড়ে আছে, সেখানে

বাঙালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতি দূরবীন ব্যবহার করেও চোখে পড়েনা। রবীন্দ্র সদনে চিরনিদ্রায় শায়িত কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন না করে ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী সে সময়ে পার্ক স্ট্রীটে মিউজিক ওয়ার্ল্ডে জনৈক রিতিক রোশনের সংগে বেলেল্লাপনায় মেতে ছিল। এই আজকের বাঙালির সাংস্কৃতিক নমুনা।

টালা থেকে টালিগঞ্জ–সবখানেই হিন্দিগানের কলিতে মুখরিত, রবীন্দ্রনাথ, সলিলের গান অগাধ সলিলেই বিসর্জিত হয়েছে। যে জাতি নিজ সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ে, তার পতন অনিবার্য, তাই বাঙালি আজ সর্বক্ষেত্রে অবনমিত হয়ে পড়েছে।

বাংলা ভাষার পক্ষে কিছু বললেই, তাকে ইংরেজি বিদ্বেষী বলে প্রচার করা হচ্ছে। এটা কেন? কে বলে আমরা ইংরেজি শেখার বিরোধী? আমরা চাই সবাই ইংরেজিটা ভালোমতোই শিখুক, ভালোভাবেই শিখুক, কিন্তু ইংরেজি শিখতে গিয়ে বাংলা ভুলতে হবে কেন? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজির বাজারদর যতই বাড়ুক, জাপান, চীন বা ইউরোপীয় দেশগুলি সে কারণে তাদের ভাষার গুরুত্ব নিজেদের দেশে জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে কমিয়ে দিয়েছে, এমন কোন খবর কিন্তু এখনও নেই, বরং শিক্ষা থেকে জীবিকার ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে তাদের মাতৃভাষার স্বাভাবিক ব্যবহার করতে পেরেছে বলেই উন্নতির শিখরে উঠতে পেরেছে। আমরা সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি না ঘটিয়ে যদি শুধু ইংরেজি শিক্ষা বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমেরিকার সমকক্ষ হতে চাই, তাতে রং মেখে সঙ সাজাই হবে, লাভ কিছুই হবেনা। ময়ূরপুচ্ছধারী কাককে কোন বুদ্ধিমান মানুষই ময়ূর বলে গণ্য করেনা।

কলকাতার কসমোপলিটানিজম চরিত্রকে উল্লেখ করে উদার বাঙালি মহানগরীর বাংলাহীনতা যারা সমর্থন করে থাকেন, তারা বোধহয় অবহিত নন যে, প্যারিস, নিউইয়র্ক, বার্লিন, হংকং, মুম্বাই এবং ব্যাঙ্গালোর কসমোপলিটান নগর হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানগুলিতে যথাক্রমে ফরাসি, ইংরেজি, জার্মান, চীনা, মারাঠি তথা কন্নড় ভাষার রাজত্ব কায়েম আছে। বিভিন্ন জাতির আগমনে ভূমিজ ভাষা ও সংস্কৃতিকে নির্বাসনে পাঠানোর তো প্রশ্নই নেই, বরং সে সব নগরে ভূমিপুত্রদের ভাষা শিখতে বাধ্য করা হয়, অথচ বাঙালি কসমোপলিটানিজমের দোহাই দিয়ে নিজ মাতৃভাষাকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমাধিস্থ করেছে। বহিরাগত হিন্দিভাষীর ভয়ে (হ্যাঁ ভয়েই) ভূমিপুত্র বাঙালিরাই নিজের ভাষা বলে না। কোহিমা, ভুবনেশ্বর, চেন্নাই, আহমেদাবাদে যথাক্রমে নাগা, ওড়িয়া, তামিল, গুজরাটিদের সদম্ভ পদক্ষেপ ও আচরণ দেখলেই আমাদের আত্মমর্যাদার রূপটা বড় নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

সাধারণ জনগণ তো কে কতোটা হিন্দিতে ডুবে বাংলা ভুলতে পারে–সেই প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। হিন্দি ইংরেজি মিশ্রণে বাংলা বলা বা একেবারেই বাংলা বলতে না পারার মধ্যে লুকিয়ে আছে আজকের বাঙালির গৌরব ! হয়তো আজ থেকে একশো বছরের মধ্যে সেদিন আসছে, যেদিন কলকাতায় আসা পর্যটকদের ধাপার মাঠে নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে এ অঞ্চলের ভূমিপুত্ররা ঠিক কী রকম ছিল। "

মোদ্দা কথায় আসি, সুভাষ বসুর চরিত্রে অহরহ কালিমা লেপনের সময় আমরা অনেকেই চুপ থাকি, আসামে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি সরালেও আমাদের ভাবান্তর জাগে না, ত্রিপুরায় সুকান্তের মূর্তি ভাঙার বেলাতেও আমাদের বিশেষ হোলদোল হয় না। আগামিতে আপনার ইষ্টদেবতা বা বাড়িঘর ভাঙতে আসলে, তখন কি আর বাধা দেয়ার শক্তি থাকবে? যদি বলেন, ভিনদেশি হয়ে আপনি কে মশাই এত বড় বড় বুলি মারার, তাহলে সবিনয়ে জানাব, আপনার সংস্কৃতি কিন্তু আমারও সংস্কৃতি, একই ভাষা-সংস্কৃতির ধারক-বাহক-উত্তরাধিকারী আমরা, টুপি-টিকিতে এই অভিন্ন পরিচয় মুছে যাবে না। আজ আপনার রোগবালাই কাল কিন্তু আমার ঘরেও ঢুকবে, বলা যায় ঢুকেই গেছে।

আগামিতে আপনার ভাষা-সংস্কৃতি মারা গেলে, আমারটার অস্তিত্বও বিপন্ন হবে, এ জমানায় একলা চলা কোনো আশা বা প্রত্যয় জাগায় না। নেতাজি বা গান্ধীজীর মতো যুগস্রষ্টা নেতাদের আশায় বসে না থেকে যার যার অবস্থান থেকে এ নিয়ে কাজ করে যান, সময় বদলাতেও পারে।

সংকীর্ণ কোটারি স্বার্থে কিংবা মনের ভয়েই যদি আজ আমরা আমাদের ভাষা-সংস্কৃতি ত্যাগ করি, তবে জেনে রাখুন, আগামিতে নিশ্চিতভাবেই আমাদেরকে নিজেদের ঘরদোর, জায়গা-জমি ছেড়ে ভাগতে হবে। জানেনই তো দলবদ্ধতায় জয়, বিভাজনে পরাজয়। আপনার জয়, আমার জয়; আপনার পরাজয়, আমারও পরাজয়।

স্কুল সাইকোলজিঃ সূচনা থেকে বর্তমান

এস এম আবু বকর সিদ্দিকী
মাস্টার্স (স্কুল সাইকোলজি, ৪র্থ ব্যাচ)
মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞানের আধুনিকতম শাখাগুলোর মধ্যে অন্যতম হল মনোবিজ্ঞান। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে মনোবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা ও ভাবনার প্রয়োজন প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মুহূর্তে আমরা মনকে যেভাবে বিজ্ঞানের আলোয় জানি, অতীতে ঠিক এমনভাবে জানতাম না। সময়ের সাথে সাথে আমরা মনোবিজ্ঞানের অনেক শাখা এখন দেখতে পাচ্ছি। প্রতিটি শাখাই কোন না কোন ভাবে ভূমিকা রাখছে জীবনের পথচলায়। মনোবিজ্ঞানের শাখা হিসেবে দিন দিন নিজস্ব আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে স্কুল সাইকোলজি ।

স্কুল সাইকোলজির যাত্রা শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে।স্কুল সাইকোলজি প্রধানত ফলিত মনোবিজ্ঞান (Functional Psychology) থেকে এসেছে, এছাড়া এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির। স্কুল সাইকোলজির সূচনার পেছনের গল্পে নিউক্লিয়াস হয়ে আছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে শিশুদের দিকে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন। এসব পরিবর্তনের মধ্যে ছিল শিশুদের স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা, কিশোর আদালত ও শিশু শ্রম আইন গঠন করা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করার জন্য। এসময় শিশুদের মানসিক বিকাশের দিকটাও সামনে চলে আসে এবং ধীরে ধীরে সমাজের মানুষের চিন্তায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। আগে যেখানে শিশুদের দেখা হত শ্রমের অর্থনৈতিক উৎস (economic source of labor) সেখান থেকে পরিবর্তন হয়ে ভাবতে শুরু করে স্নেহ ভালবাসার মানসিক উৎস (psychological source of love and affection)। এই যে পরিবর্তন হচ্ছে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির, তখন থেকেই স্কুল সাইকোলজির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে শুরু করে।

ইতিহাসবিদ থমাস ফ্যাগান (Thomas Fagan) মনে করেন সকল শিশুদের স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা স্কুল সাইকোলজির উৎপত্তির প্রধান উৎস। এই বাধ্যবাধকতার ফলে অনেক শিশু স্কুলে আসছে যারা শারীরিক অথবা মানসিকভাবে অসুস্থ। তখন এই শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিকল্প পদ্ধতি পণয়ন করা প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন আর এই বাচ্চাদের চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে তাদের পরিপূর্ণ বিকাশে সহযোগিতা করার জায়গা থেকেই স্কুল সাইকোলজির যাত্রা শুরু। এই সময়টা থেকে ধীরে ধীরে স্কুল সাইকোলজি নিজের স্বতন্ত্রতা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সাইকোলজি পরিবারের অন্যতম অপরিহার্য অংশ হিসেবে।

স্কুল সাইকোলজির অগ্রযাত্রায় যে মানুষগুলো অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন Lightner Witmer, Granville Stanley Hall, Arnord Gesell, Gertrude Hildreth প্রমুখ। Lighter Witmer কে স্কুল সাইকোলজির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনিই প্রথম ১৮৯৬ সালে বাচ্চাদের মানসিক সুরক্ষা ও গাইডলাইন দেওয়ার জন্য ক্লিনিক চালু করেন পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Pennsylvania)। হুইটম্যার এর লক্ষ্য ছিল সাইকোলজিস্টদের ভূমিকা হবে তারা শিক্ষকদের সাথে কাজ করবেন শিশুদের শেখার সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে, মানসিক বিকাশে এবং প্রত্যক শিশুকে স্বতন্ত্র (individual) হিসেবে চিহ্নিত করে তার সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে। গ্রানভিল স্টেনলে হল (Granville Stanley Hall) এর কাজের ক্ষেত্র এর একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল প্রশাসক, শিক্ষক আর শিশুদের অভিভাবকদের নিয়ে।

স্কুল সাইকোলজির এই যাত্রা পথে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয় ১৯৪৫ সালে American PsychologicalAssociation (APA) কর্তৃক স্বতন্ত্র ডিভিশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ। স্কুল সাইকোলজি APA এর

১৬তম ডিভিশন। এটি স্কুল সাইকোলজিস্টদের সবচেয়ে পুরাতন সংগঠন।এর পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে নিউইয়র্ক এর ওয়েস্ট পয়েন্ট এ থেয়ার কনফারেন্স (Thayer Conference) অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ৯ দিনব্যাপী এ কনফারেন্স এর আয়োজক ছিল American Psychological Association (APA). এখানে ৪৮ জন বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল স্কুল সাইকোলজিস্ট এর ভূমিকা, কার্যক্ষেত্র, প্রয়োজনীয় ট্রেনিং নির্ধারণ করা দিনশেষে সর্বোপরি স্কুল সাইকোলজিস্টকে সংজ্ঞায়িত করা। এই ইভেন্টকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার করার কারণ আজকে যে স্কুল সাইকোলজির বিকাশ সেখানে এই কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রাথমিক একটা রূপরেখা তৈরি হয় এই জগতের এবং পূর্ববর্তীতে যারা মনোবিজ্ঞান এর এই শাখায় কাজ করতো তারা বিভিন্ন টাইটেল ব্যবহার করতো কিন্তু এই কনফারেন্স এর সাহায্যে তারা একটা নির্দিষ্ট পথ খুঁজে পেল, শুরু হল নতুন যাত্রা। এর পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে আমেরিকায় গঠিত হয় National Association of School Psychologists(NASP) যে প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে স্কুল সাইকোলজির বিকাশে এবং স্কুল সাইকোলজিস্টের কাজের ক্ষেত্র নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে International School Psychology Committee (ISPC) গঠিত হয়।

স্কুল সাইকোলজির কাজের প্রধান ক্ষেত্র শিশুদের মানসিক বিকাশে সহায়তা করা একইসাথে তাদের বয়স উপযোগী কারিকুলাম তৈরিতে সহায়তা করা। একজন স্কুল সাইকোলজিস্ট শিশুদের সাহায্য করে শিক্ষণের ক্ষেত্রে, সামাজিকভাবে, আচারণগতভাবে সর্বোপরি একজন সফল মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে। তাঁরা বাচ্চাদের অধিকার নিয়ে কথা বলে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিকল্প কারিকুলাম প্রণয়ন করে। যদিও বাচ্চাদের দিকেই তাঁরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় কিন্তু বাচ্চাদের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য তাঁরা অভিভাবক, শিক্ষক ও স্কুল প্রশাসকদের সহযোগিতা করে থাকে।

২০০৭ সালে এক গবেষণায় দেখা যায়, বিশ্বের ৮৩টি দেশে স্কুল সাইকোলজির সেবা চালু আছে। সেখানে স্কুল সাইকোলজিস্টরা যথাযথ ভূমিকা পালন করছেন। বর্তমানে এর ব্যাপ্তি আরও অনেক দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সময়ের সাথে সাথে স্কুল সাইকোলজির প্রয়োজনীয়তা ও জনপ্রিয়তা বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ হতে অধ্যাপক ড. মোঃ কামাল উদ্দিন এর নেতৃত্বে স্কুল সাইকোলজিতে এক বছর মেয়াদী প্রফেশনাল এমএস প্রোগ্রাম চালু হয়েছে যা বাংলাদেশে প্রথম। ইতিমধ্যে তিনটি ব্যাচ সাফলোর সঙ্গে তাঁদের এমএস প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেছে এবং বর্তমানে চতুর্থ ব্যাচ তাদের নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছে।

সময়ের নিরন্তর পথচলায় জীবনের গল্প যদি হয়ে যায় শুধু টেকনোলজি আর বিশ্বায়নের পূর্ণতায়, পেছনে হয়ত প্রাপ্তির খাতা ভরে যাবে সাফল্য আর সাফল্যের পৌনঃপুনিকতায়, তবে হারিয়ে যেতে পারে চলমান জীবনের প্রশান্তি আর সন্তুষ্টির পূর্ণতা । তাই প্রশান্তির নির্যাসে জীবনকে অর্থবহ করে তোলার জন্য প্রয়োজন মানসিক সুস্থতা এবং পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশ। আর পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশের মাধ্যমে যদি জীবন ভরে যায় আলোয় আলোয়, তবেই স্বপ্ন পূরণের গল্প হবে স্কুল সাইকোলজির স্বপ্নীল যাত্রা।

সেলুলার মেমোরি: ব্যক্তিত্ব বিস্ময়

খাদিজা আহসান
স্নাতক ৩য় বর্ষ, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রহস্যময় এই পৃথিবী, বিচিত্র তার রূপ; আরো বিচিত্র মানুষের মন। মনোসমুদ্রে তরী ভাসিয়ে জীবনের ভেলা পার করতে করতে হাজারো বিচিত্রতার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি তার আপন খেয়ালে এসব বিচিত্রতার জন্ম দিয়ে মানুষকে তার সাক্ষী করে রাখে অনন্তকালের জন্য।

স্মৃতি মানুষের একটি অনন্য সম্পদ, ক্ষেত্র বিশেষে সম্বল। এই স্মৃতি নিয়ে রহস্য আর বিস্ময়েরও অবধি নেই। মানুষ আছে বলেই যেমন মনোবিজ্ঞান আছে, তেমনি স্মৃতি আছে বলেই মানুষ আছে। মনোবিজ্ঞানের আঙ্গিকে স্মৃতির সংজ্ঞায় মনোবিজ্ঞানী নীহাররঞ্জন সরকার বলেছেন, "স্মৃতি হল শিক্ষণ ও শিক্ষণকৃত আচরণের পুনরুৎপাদন, এ দুয়ের মধ্যবর্তী একটি প্রক্রিয়া"। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্মৃতির সাধারণ আধার মস্তিষ্ক, সেখানেই তার উৎপত্তি, বিস্তার ও বিকাশ। মস্তিষ্কের Temporal lobe এর hippocampus এর জন্য দায়ী।

তবে আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান বিস্ময়ে অভিভূত হয় যখন জানা গেল, স্মৃতির একমাত্র আসন মস্তিষ্কে নয়; বরং সমগ্র শরীরেই তার পূর্ণ আধিপত্য! আর সে স্মৃতিই নির্ধারণ করবে–কোন মানুষটির ব্যক্তিত্ব কেমন হবে! বলা যায়, এ প্রভাবশালী স্মৃতি মানব ব্যক্তিত্বের নির্ধারক। রহস্যময়ী এই স্মৃতির নাম 'সেলুলার মেমোরি' (cellular memory)। জৈব-মনোবিজ্ঞানের এক অপার বিস্ময় এই সেলুলার মেমোরি।

সেলুলার মেমোরির মূল কথা, স্মৃতি মস্তিষ্কের বাইরেও দেহের অন্যান্য স্থানে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত হতে পারে। একে সেল মেমোরি বা বডি মেমোরি (body memory) ও বলা যায়, যা মানুষের দেহকোষে সঞ্চিত থাকে। এই দেহ-স্মৃতির মধ্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মূল সূত্র (personality traits) নিহিত থাকে। মানবদেহের মূল অঙ্গগুলো এক-একটি, স্মৃতির স্বতন্ত্র ধারক ও বাহক। সেলুলার মেমোরির অস্তিত্ব প্রথম প্রমাণিত হয় অঙ্গপ্রতিস্থাপন এর ঘটনার মাধ্যমে।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ফলে অঙ্গটির সাথে সাথে গ্রহিতার শরীরে চলে আসে দাতার ব্যক্তিত্বের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য! ফলে অঙ্গ গ্রহিতা ডোনারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে; যার অনিবার্য পরিণতি অঙ্গগ্রহিতার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন। এক্ষেত্রে হতে পারে গ্রহিতার খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন, যৌন বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন, ব্যক্তিগত অভ্যাসের পরিবর্তন, আচরণিক ও মনোভাবগত পরিবর্তন ইত্যাদি। কিংবা দেখা দিতে পারে তার মধ্যে কোন নতুন দক্ষতা যা আগে দেখা যায়নি।

অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কারণে গ্রহিতার দেহে ডোনারের গুণাবলি প্রকাশ পাওয়ার এই আশ্চর্য জৈব-মনোবৈজ্ঞানিক ঘটনার নাম– "সেলুলার মেমোরি ফেনোমেনা" (cellular memory phenomena)। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আমাদের দেহের কোষে অসংখ্য ডিএনএ (DNA) রয়েছে যাকে দেহের blueprint বলা হয়। এই ডিএনএ বিগত জীবন থেকে বর্তমান জীবন পর্যন্ত মানুষের সব কিছুর বিস্তারিত আপডেট রাখে। ফার্মাকোলজিস্ট Kandek Part এর মতে, দেহের প্রতিটি কোষে নিউরোপেপটাইড নামক বায়োকেমিক্যালের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা মূলত ব্রেইনের

নিউরন দ্বারা নিঃসৃত দূত যা সারা দেহে কোন বার্তা পৌঁছে দেয় রক্তের মধ্যে দিয়ে। এই ধরনের দূত রয়েছে দেহের মূল অঙ্গগুলোতে যেমন– হৃদয়, ফুসফুস, যকৃৎ, কিডনি, অস্থিমজ্জা, মাংসপেশী-- যারা ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ রাখে আর অন্যের দেহে গিয়েও পুরনো স্মৃতি ভোলে না, বরং অটুট রাখে। তাই ডোনারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রাপকের মাঝে ধরা পড়ে।

সেলুলার মেমোরি নিয়ে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তার নাম, 'এপিজেনেটিকস' (epigenetics)। সর্বপ্রথম সেলুলার মেমোরি ফেনোমেনার কথা জানা যায়, হৃদয় প্রতিস্থাপনের একটি কেসে, যেখানে গ্রহিতার স্বভাবের উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায়। রক্ত পরিসঞ্চালনের ফলেও মৃদু আচরণিক ও আবেগিক পরিবর্তন হয় বলে বিস্ময় প্রকাশ করেন আমেরিকার হনুলুলু বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী ও গবেষক Meredith Myer।

তবে, লোহিত রক্ত কণিকায় নিউক্লিয়াস না থাকায় ডিএনএ ও থাকে না আর তাই কোষগুলো সেলুলার মেমোরি ধারণ করতে পারে না। শ্বেতরক্তকণিকা আর অণুচক্রিকা শুধু মাত্র সেল মেমোরি বহনে ভূমিকা রাখে কিন্তু রক্তে তাদের সংখ্যা তুলনামূলক কম থাকায় রক্ত গ্রহণে ব্যক্তিত্বের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। আরও জানা যায়, দেহের মূল বৃহৎ অঙ্গগুলোর প্রতিস্থাপনে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হলেও চোখের কর্নিয়া প্রতিস্থাপনে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয় না কারণ কর্নিয়াতে অধিক পরিমাণ নিউরন থাকে না। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে থাকে হার্ট প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে, তাই গবেষকরা বলেছেন–There is a little brain in the heart।

মানবদেহের এই একনিষ্ঠ দায়িত্ব পালনকারী সেলুলার মেমোরির গুরুগম্ভীর আলোচনা থেকে বেরিয়ে এসে এবারে সেলুলার মেমোরি ফেনোমেনা ঘটিত বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কিছু কাহিনী শোনা যাক।

১। ক্লেয়ার সিলভিয়া ছিলেন নিউ ইংল্যান্ড এ বসবাসরত প্রথম আমেরিকান নৃত্যশিল্পী যিনি হার্ট এবং ফুসফুস প্রতিস্থাপনের পর প্রবলভাবে ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনের শিকার হন। ৪৭ বছর বয়সী এই মার্কিন ১৯৭০ সালে মোটর বাইক অ্যাকসিডেন্টে মারা যাওয়া এক ১৮ বছর বয়সী যুবকের হার্ট এবং ফুসফুস পেয়েছিলেন। অপারেশনের পর সিলভিয়া হঠাৎ করে চিকেন নাগেট, মদ, স্নিকার্স চকলেট এবং কাঁচা মরিচ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তার কেনটাকি ফ্রাইড চিকেন আর মদ খেতে ইচ্ছে করতে যা পূর্বে তিনি কখনই পছন্দ করতেন না। আরও সাংঘাতিক এই যে সার্জারির পর সিলভিয়া অনবরত Tim Lamirande নামে একজন যুবক কে স্বপ্ন দেখতেন।

পরে খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন তার ১৮ বছর বয়সী ডোনার ছিল এক যুবক যার নাম Tim Lamirande! যার পছন্দের খাবার ছিল চিকেন নাগেট, মদ, স্নিকেরস চকলেট এবং কাঁচা মরিচ! বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়, সিলভিয়া অপারেশনের পর লক্ষ করেন, তিনি পুরুষদের মত হাঁটছেন এবং নিজেকে পুরুষদের মত শক্তিশালী মনে হচ্ছে; এমনকি তার মধ্যে নারীসুলভ নমনীয়তা কমে গেছে, পুরুষসঙ্গী মোটেও ভাল লাগছে না বরং নারীদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে!

ক্লেয়ার সিলভিয়া তার জীবনে হার্ট এবং ফুসফুস প্রতিস্থাপন জনিত ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন "A Change of Heart" নামক একটি বই।

২। আমেরিকার অ্যারিজোনার ২৪ বছর বয়সী জামিয়া শেরমান হার্ট প্রতিস্থাপনের পর দেখলেন তিনি সবসময় অত্যন্ত ক্রোধান্বিত বোধ করছেন এবং মারামারি করতে ইচ্ছে করছে। হঠাৎ তার এই অভূতপূর্ব আচরণে তিনি নিজেই বিস্মিত হয়ে গেলেন। এছাড়াও আকস্মিকভাবে তিনি মেক্সিকান খাবারের প্রতি দারুণ আকৃষ্ট হয়ে পড়েন যা অপারেশনের আগে তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না। পরে তিনি জানতে পারেন, তার হার্ট ডোনার স্কট ফিলিপ্স মারা গিয়েছিলেন একটি মারামারি খেলার প্রতিযোগিতায় মুষ্টিযুদ্ধ করতে গিয়ে। আর স্কট ছিলেন মেক্সিকান খাবারের ভক্ত।

জামিয়া এতক্ষণে বুঝলেন কেন তার মেক্সিকান খাবার ভাল লাগছে আর কেন মারামারি করতে ইচ্ছে করছে। স্কট ফিলিপ্স খেলায় মৃত্যুবরণ করে হেরে যান, যার অতৃপ্তির ক্রোধ বহন করছিল তার মৃত হার্ট। তাই সে হার্ট শেরমান কেও করে তুলেছে ক্রোধান্বিত !

৩। সেলুলার মেমোরি মানুষকে মৃত্যুর আঁধারে পর্যন্ত ঠেলে দিয়েছে। ১৯৯৫ সালে আমেরিকার জর্জিয়ার সনি গ্রাহামের দেহে হার্ট প্রতিস্থাপন করা হয়। ২০০৮ সালে তিনি ৬৯ বছর বয়সে গলায় বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করেন। পরে জানা যায়, গ্রাহামের হার্ট ডোনার টমি কটেলও ঠিক একই ভাবে আত্মহত্যা করেছিলেন!!

৪। আমেরিকার জর্জিয়ার আটলান্টার ১৭ বছর বয়সী অ্যামি টিপিন্স এর ১৯৯৩ সালে লিভার প্রতিস্থাপনের পর শুধু হ্যামবার্গার খেতে ইচ্ছে করত। অপারেশনের পর তিনি জনকল্যাণমূলক এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজে গভীর প্রেরণা অনুভব করতেন। আরও বিস্ময়, তিনি হঠাৎ হার্ডওয়ারের বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বোধ করছেন। এমনকি নিজের অজান্তেই হাত দিয়ে এমন সব দক্ষতা নিয়ে কাজ করছেন যা তিনি কখনো করেননি বা সে কাজের দক্ষতা তার কোনদিন ছিলনা। পরে জানা গেল, তার ডোনার মাইক জেমস ছিলেন আমেরিকান মার্শাল এবং হ্যামবার্গার তার অন্যতম পছন্দের খাবার ছিল! তিনি হাত দিয়ে কাজ করতে ভালবাসতেন এবং বিল্ডিং তৈরির প্রকল্পে কাজ করতেন; উপরন্তু তিনি মানুষকে সাহায্য করতে ভালবাসতেন।

৫। ইংল্যান্ডের প্রিসটনের শেরিল জন্সন দাবি করেছিলেন কিডনি প্রতিস্থাপনের পর তার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে। তিনি প্রতিস্থাপনের পর বেশ বদমেজাজি স্বভাবের হয়ে যান যেমন তিনি একেবারেই ছিলেন না। তিনি পছন্দ করতেন সমসাময়িক সাহিত্য কিন্তু কিডনি প্রতিস্থাপনের পর তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন ক্লাসিক সাহিত্যের প্রতি।

৬। আমেরিকার অ্যারিজোনার বিল অহল বেশ ঘরকুনো প্রকৃতির ছিলেন; বনেবাদাড়ে অ্যাডভেঞ্চার করে বেড়ানোর থেকে একাকি ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু হার্ট প্রতিস্থাপনের পর তিনি কেবলই ঘরের বাইরে বেড়ানো, অ্যাডভেঞ্চার মূলক কাজ করার তাড়না অনুভব করতেন। এমনকি সাইকেল চালান থেকে শুরু করে সব চ্যালেঞ্জিং কাজ করতে লাগলেন। আর একজন বিশেষ গায়কের গান শুনলে তার ভাল লাগে যার গান তিনি কখনোই আগে শোনেননি। জানা গেল তার ডোনার মাইকেল ব্রাডি হলিউডের অভিনেতা যিনি চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। আর সেই বিশেষ গায়ক ছিল মাইকেল ব্রাডির অন্যতম প্রিয় গায়ক।

৭। নিউইয়র্কের উইলিয়াম শেরিডানের ছিল ক্যাটারিং এর ব্যবসা। তার হার্ট প্রতিস্থাপনের পর দেখা গেল, ছবি আঁকার প্রতি তার দারুণ ঝোঁক তৈরি হয়েছে। অথচ তিনি অপারেশনের আগে আঁকার কথা ভাবতেই পারতেন না আর এখন অত্যন্ত ভাল আঁকছেন! আঁকাটা তার শখে পরিণত হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শেরিডানের ডোনার কেইথ নেভিলে ছিলেন আসলে একজন চিত্রশিল্পী।

৮। ৪৭ বছর বয়সী এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক ১৭ বছর বয়সী এক কৃষ্ণাঙ্গের হার্ট পেয়েছিলেন যার মৃত্যু হয় অ্যাকসিডেন্টে। হার্ট প্রতিস্থাপনের পর দেখা গেল ভদ্রলোক হঠাৎ করেই ক্লাসিক্যাল মিউজিকের ভীষণ ভক্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এর আগে তার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না। পরে জানা গেল তার ডোনার কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটি ছিল বেহালা বাদক; অ্যাকসিডেন্ট এর সময় সে বাহালা বাজানো শিখতেই যাচ্ছিলো আর মৃত্যুও হয়েছিল বেহালা বুকে জড়িয়ে ধরে!

৯। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস এর ২৪ বছর বয়সী ডেভিড ওয়াটার পেয়েছিলেন মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা যাওয়া ক্যাডেন ডেলানির হার্ট। সার্জারির পর ওয়াটার হঠাৎ ভুট্টার তৈরি স্ন্যাক বার্গার রিং খেতে চাইলো, যা সে ইতোপূর্বে কখনোই পছন্দ করতো না। এরপর জানা গেল, ডেলানির একটি পছন্দের খাবার ছিল এই স্ন্যাক বার্গার রিং।

১০। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনের ঘটনাগুলোর মধ্যে এখন অবধি একটি কেস পাওয়া গেছে যেখানে, প্রাপকের রক্তের group পরিবর্তিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার ১৫ বছর বয়সী যুবতী ডেমি লি ব্রেন্নার লিভার প্রতিস্থাপনের পর দেখা গেল তার রক্তের group পরিবর্তিত হয়ে গেছে। নতুন লিভারের stem cell এর জন্য সে দাতার রোগ-প্রতিরোধ শক্তি লাভ করেছিল। ফলে তার অস্থিমজ্জাও প্রতিস্থাপিত হয়ে গিয়েছিল।

১১। ইংল্যান্ডের নর্থ সমারসেট এর ম্যাশফরড একজন সাইকেল আরোহীর হার্ট পেয়েছিলেন। অপারেশনের আগে তিনি কদাচিৎ সাইকেলে চড়েছেন। কিন্তু অপারেশনের ৭ দিন পর তিনি ডাক্তারকে একটি বাইসাইকেল এনে দিতে বলেন এবং প্রতি সপ্তাহে চালানো শুরু করলেন। ২ মাস পর দেখা গেল তিনি সাইকেল চালনায় দারুণ পারদর্শী হয়ে উঠেছেন এবং একটি রোড বাইকও কিনে ফেলেছেন।

১২। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিস্ময়কর ফলাফলের মধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যা প্রায় অবিশ্বাস্য। ৮ বছর বয়সী একটি মেয়ে পেয়েছিল ১০ বছর বয়সী এমন এক মেয়ের হার্ট যে আততায়ীর হাতে খুন হয়েছিল। অপারেশনের পর মেয়েটি কেবলই ঘুমের মধ্যে এমন দুঃস্বপ্ন দেখতো যেখানে কেউ তাকে আক্রমণ করছে এবং মেরে ফেলছে। মেয়েটি মনোবিদের শরণাপন্ন হয় এবং স্বপ্নে দেখা আক্রমণকারীর বর্ণনা দেয় পুলিশকে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, পুলিশ সেই স্বপ্নের বর্ণনা শুনে ডোনার মেয়েটির খুনিকে ধরতে সক্ষম হয়!!

১৩। ৬৫ বছর বয়সী রিচার্ড মাঙ্গিনোর দুটি হাত প্রতিস্থাপন করা হয়। দেখা গেল তিনি অপারেশনের পর নতুন কিছু শৈল্পিক কাজ করছেন যা তাকে আগে করতে দেখা যায়নি। যেমন ছবি আঁকছেন, পিয়ানো বাজাচ্ছেন, গিটার বাজাচ্ছেন। এমনকি গৃহস্থালির কাজকর্মও করছেন উৎসাহ নিয়ে।

১৪। ইংল্যান্ডের শাউন বার্ডের হার্ট প্রতিস্থাপনের পর তার রান্না করার আকর্ষণ প্রচন্ড বেড়ে যায় এমনকি তিনি দক্ষ রাঁধুনির মতো রান্না করাও শুরু করেছেন। যা তার অপারেশনের আগের জীবনের সাথে একেবারেই বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

১৫। একজন অন্তঃসত্ত্বা নারী দাবি করেছিলেন গর্ভাবস্থায় দেহে রক্ত পরিসঞ্চালনের ফলে তার আবেগিক ও আচরণিক পরিবর্তন হয়েছে। ১ম ও ২য় গর্ভধারণের সময় তিনি ভিন্ন ভিন্ন ২ ব্যক্তির রক্ত নিয়েছিলেন তাতে ২ বার তার মধ্যে ২ ধরনের আচরণিক পরিবর্তন হয়।

এমনি কিছু অত্যাশ্চর্য ঘটনা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানে সাক্ষী হয়ে আছে। একজন ব্যক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন অভ্যাস বা দক্ষতার আনয়নে সেলুলার মেমোরি ফেনোমেনা এখন একটি যুগান্তরি নাম। ভাবতেই অবাক লাগে, একজন ব্যক্তি মৃত্যুর পর এ ধরাধাম ছেড়ে চলে গেলেন অথচ তার অঙ্গ অন্যের দেহে তারই ব্যক্তিত্ব নিয়ে তারই অস্তিত্ব বহন করে চলেছে! তার রেখে যাওয়া অঙ্গের অবিনশ্বর সেলুলার মেমোরি গুলো অন্যের দেহে গিয়েও তাদের প্রকৃত ঠিকানা ভোলেনা। আর যার দেহে গেল, সেও তার আমিত্ব আংশিক হারিয়ে ফেলে। অন্যের ব্যক্তিত্ব আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাকে নিজের বলে মেনে নিতে হয়।

সৃষ্টির রহস্য মাঝে মাঝে আমাদের বোধ ও উপলব্ধির সীমানা ভেদ করে যায়। নিজের মৃত্যুর পর অন্যের দেহে নিজের অস্তিত্ব অমর করে রাখার এক দুর্দান্ত প্রয়াস সেলুলার মেমোরি ফেনোমেনা। "কয়লা ধুলে ময়লা যায় না", মানবচরিত্রের পরিবর্তনশীলতার বিপক্ষের এই প্রবাদ বাক্যে এবার বোধহয় পরিবর্তন আসবে। অন্তত কয়লা ধুয়ে ময়লা দূর করার একটি পন্থা তো পাওয়া গেল!

পূর্বে পড়া একটি উক্তি সেলুলার মেমোরি ফেনোমেনা প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল- "জীবন যেন এখানে দেহের প্রতিশব্দ; মৃত্যুই সেখানে শেষ কথা নয়"।

সক্রেটিস বলেছিলেন, " know thyself "। এত সব জানার পর আমার বলতে ইচ্ছে করছে, "know your body and mind"। মনকে জানার জন্য প্রয়োজন চিন্তার সাগরে অবগাহন, মনোবিজ্ঞানের পাঠ; আর মনোবিজ্ঞানের কাছে পৌঁছানোর জন্য মনোতরী তো রয়েছেই।

শিক্ষণতত্ত্বের প্রয়োগ

আমিনুল ইসলাম
মাস্টার্স (স্কুল সাইকোলজি, ৪র্থ ব্যাচ)
মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মানুষ প্রতিনিয়ত ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি অথবা সমস্যার সম্মুখীন হয়। জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে এই সমস্যাগুলো থাকে খুবই সরল প্রকৃতির যা শিশুরা নিজেদের সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারাই সমাধান করতে পারে। শিশুরা এসময় বাবা-মা এবং অন্যান্য শুশ্রূষাকারীর উপর নির্ভর করে যারা তার জটিল সমস্যাগুলো সমাধান করে দেয়। শিশুরা শৈশবকালে ৫-৬ বছর বয়সের মধ্যেই বুঝতে পারে যে, পরিবেশ সবসময় তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলবে না। তারা আরো লক্ষ করতে থাকে যে, তাদের চাহিদা, চিন্তা-ভাবনা ধীরে ধীরে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এই অধিকতর জটিল সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য প্রতিনিয়ত তাদের নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। আর একেই বলা হয় শিক্ষণ প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, শিক্ষণের সংজ্ঞায়িত রূপ হচ্ছে, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ দ্বারা আচরণের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসে। উল্লেখ্য যে, শিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে এর তুলনামূলক স্থিতিশীলতা।

জীবনের কিছু সমস্যা আছে যেগুলোর সমাধান আমরা অবচেতন ভাবে নিজেদের সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই পেয়ে যাই। যেমন, হাত দিয়ে গরম কিছু অনুভব করলে সাথে সাথে হাত সরিয়ে নেয়া, ক্ষুধা অনুভব করলে কান্না করা (শিশুদের ক্ষেত্রে)। এগুলো খুবই সরল প্রকৃতির সমস্যা যা একটি নীচু শ্রেণীর প্রাণীও সমাধান করতে সক্ষম। মানুষের বিবেক বিবেচনা বোধ মানুষকে অন্যান্য নীচু শ্রেণীর প্রাণী থেকে পৃথক করেছে। এজন্য প্রতিনিয়ত তাকে অনেক কঠিন থেকে কঠিনতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আর এসব জটিলতর সমস্যা সমাধানের জন্য আনুষঙ্গিক অভিজ্ঞতারও আমূল পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। অর্থাৎ, প্রয়োজন উন্নততর শিক্ষণ।

আমরা কিভাবে শিখতে পারি ? কোনো একটা সমস্যা বিভিন্ন দিক থেকে সমাধান করা যায়। কিন্তু আমাদের চাহিদা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে অল্প পরিশ্রমে কোনো সমস্যা সমাধান করা। যেমন, কেউ প্রশ্ন করলো, কখন একটি গাণিতিক সমস্যার ফলাফল ৪ হয় ? সমাধান হিসেবে আমরা সাধারণত বলবো ২ আর ২ যোগ করলে ৪ হয়। আমরা কিন্তু বলবো না যে, ১০০ থেকে ৯৬ বিয়োগ করলে ৪ হয়, যদিও এটাও একটি সঠিক সমাধান। কারণ, এটি সময়সাপেক্ষ এবং কঠিন একটি সমাধান।

এডওয়ার্ড লি থর্নডাইকের পরে এ পর্যন্ত বহু শিক্ষণতত্ত্ববিদ শিক্ষণের উপর তাদের নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তবে থর্নডাইক পরবর্তী প্রায় সকল শিক্ষণতত্ত্বই থর্নডাইকের সংযোগবাদ হতে অনুপ্রাণিত। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে অনেক আলোচনা সমালোচনা সত্ত্বেও টিকে আছে সংযোগবাদের মূলনীতি; যদিও মূলনীতিগুলোতে পরবর্তী সময়ে থর্নডাইক এবং তার অনুসারীদের দ্বারা ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এ পর্যায়ে আমরা শিক্ষণতত্ত্বে সংযোগবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আলোচনা করবো।

থর্নডাইকের মতে কোনো একটা উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রথমত একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পরবর্তী ফলাফল দুই দিকের যেকোনো একটিতে ধাবিত হতে পারে, হয় এ সম্পর্ক অনুশীলনের মাধ্যমে এতটা শক্তিশালী হয় যে আমরা তা শিখে ফেলি অথবা অনুশীলন না করার ফলে সদ্য সৃষ্ট দুর্বল সংযোগটি কখনোই আর আমাদের চেতনায় আসে না। ফলে আমরা সংযোগটি ভুলে যাই। একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আমরা আরও সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করবো। আমরা যখন কোনো একটা অনুচ্ছেদ পড়ি, উক্ত অনুচ্ছেদের প্রতিটি শব্দের জন্য আমাদের মস্তিষ্কে একটি করে ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ স্থাপিত হয়। প্রথম একবার পড়ার পরেই এই সংযোগসমূহ স্থাপিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে অনুচ্ছেদটি যখন আমরা বারবার অনুশীলন করতে থাকি প্রতিটি শব্দ মজবুত ভাবে মস্তিষ্কে গেঁথে যায়। অর্থাৎ, বলা যায় যে, অনুচ্ছেদটি আমরা

শিখতে পেরেছি। কিন্তু কোনো একটা অনুচ্ছেদ যদি আমরা একবার পড়েই ফেলে রেখে দেই তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ের দুর্বল সংযোগ শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ পায় না। ফলে আমরা তা দ্রুত ভুলে যাই।

আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা বলতে পারি যে, শিক্ষণ অনেকাংশে অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। তবে থর্নডাইকের মতে অনুশীলন তখনই কার্যকর হয় যখন আমরা কোনো একটা কৃত কাজের ফলাফল সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকি। অন্ধভাবে কোনো একটা কাজ আমরা যতবারই করি না কেন বাস্তবক্ষেত্রে তা কোনো কাজে আসবে না। আর এটাই হচ্ছে থর্নডাইকের প্রভাবের মূলনীতি (Law of Effect)। যখন একটি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং এই সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যক্তি কোনোভাবে পুরস্কৃত বা অনুপ্রাণিত হয়, তাহলে ভবিষ্যতে এই বিশেষ সংযোগটি আবারও ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে, ব্যক্তি কোনো একটি কাজের জন্য সমালোচনার মুখে পড়লে ভবিষ্যতে সে কাজ এড়িয়ে চলে। ধরা যাক, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি ক্লাস পরীক্ষার আয়োজন করা হলো। পরীক্ষায় তারা যে রকমই করুক না কেন আমরা যদি তাদেরকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুপ্রাণিত করতে পারি তাহলে পরবর্তী পরীক্ষায় তারা অবশ্যই আরো বেশি পরিশ্রম করবে। অথচ আমরা সাধারণত খারাপ করার কারণে শাস্তি প্রদান করে থাকি এই আশায় যে, তারা নিজেদের সংশোধন করে ভবিষ্যতে আরও প্রচেষ্টা করবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোনটি বেশি কার্যকরী? অনুপ্রেরণা নাকি শাস্তি প্রদান? থর্নডাইক গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, শিক্ষণের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যতটা কার্যকরী শাস্তি প্রদান ততটা কার্যকরী নয়। অর্থাৎ, আমরা যদি চাই ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো করুক তাহলে কৃতকার্য-অকৃতকার্য সকলের জন্য সুপরিকল্পিত অনুপ্রেরণার ব্যবস্থা করতে হবে।

থর্নডাইকের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে একাত্মতার সূত্র (Law of Belongingness)। কোনো একটা সংযোগ খুব সহজেই শেখা যায় যদি প্রতিবার অনুশীলনের সময় ব্যক্তির অবস্থান এবং আনুষঙ্গিক তথ্যাবলি অনুরূপ থাকে। এই সূত্রটি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা এই সূত্রটির গুরুত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করবো। ধরা যাক, কোনো একজন ছাত্র একটি নির্দিষ্ট বই থেকে সারা বছর প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বইটি পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে হারিয়ে গেল। সে যদিও নতুন একটি বই সংগ্রহ করবে, একাত্মতার সূত্র অনুযায়ী, ছাত্রটির পরীক্ষা ততটা ভালো হবে না যতটা তার নিজের বই থাকলে হতো। কারণ নতুন বইতে অনেক আনুষঙ্গিক সংকেত অনুপস্থিত থাকবে যা তার স্মরণে ভূমিকা রাখতো।

থর্নডাইকের নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হচ্ছে, মূল সংযোগের প্রভাব আশেপাশে কম গুরুত্বপূর্ণ সংযোগগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। একে বলা হয় প্রভাবের বিস্তার নীতি (Spread of Effect)। বিষয়টি আমরা পূর্বে উল্লেখিত একটি উদাহরণ থেকে আরো স্পষ্ট করার চেষ্টা করবো। আমরা দেখেছি যে, কোনো একটি অনুচ্ছেদের প্রতিটি শব্দের সাথে আমাদের মস্তিষ্কে একটি করে সংযোগ স্থাপিত হয়। প্রভাবের বিস্তার নীতি বলে যে, প্রতিটি শব্দ তো অবশ্যই, এমনকি অনুচ্ছেদের প্রতিটি দাঁড়ি, কমা, পৃষ্ঠার রঙ, পৃষ্ঠা নম্বর, ও লেখার ধরণের সাথেও আনুষঙ্গিক সংযোগ স্থাপিত হয়। উল্লেখ্য যে, আমরা সাধারণত এসব আনুষঙ্গিক তথ্যাবলিতে গুরুত্ব দেই না। অথচ, প্রভাবের বিস্তার নীতি বলে যে, যদি প্রাথমিক অনুশীলন থেকে সর্বশেষ অনুশীলন পর্যন্ত এসব আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অনুরূপ থাকে, তাহলে প্রয়োজনীয় তথ্য বেশি দ্রুত আমাদের চেতনায় আসবে। সুতরাং, ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত, যে কোনো একটি বই অথবা শিট থেকে কোনো নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ পড়া।

এতক্ষণ আমরা থর্নডাইকের মূলনীতিগুলো কিভাবে প্রয়োগ করা উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এইসব মূলনীতির যথার্থ প্রয়োগ অপর একটি সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপর নির্ভর করে যা প্রস্তুতির সূত্র নামে (Law of Readiness) পরিচিত। আলোচ্য মূলনীতিগুলো আমরা তখনই সর্বোচ্চ কার্যকারিতার সাথে প্রয়োগ করতে পারবো যখন ব্যক্তি এর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবে। অনেক বাবা-মা শিশুদের পড়ানোর ক্ষেত্রে জোর জবরদস্তির আশ্রয় নেন। কিছু স্কুলও এর ব্যতিক্রম নয়। ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য তারা প্রচুর বইপত্র পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে দেয় যার জন্য তারা মোটেও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে না। তবে এটা প্রশংসাযোগ্য যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিশুদের মানসিক প্রস্তুতির উপর নজর রেখেই পাঠ্যতালিকা তৈরি করা হয়। অতএব, মানসম্মত শিক্ষার জন্য শিশুদের মানসিক প্রস্তুতির উপর নির্ভর করা উচিত।

দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটের প্রভাব

সায়মা রহমান রথি
শিক্ষক, এডুকো ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
ঢাকা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই দেশটি ডিজিটালাইজড হিসাবে পরিণত হচ্ছে। ডিজিটালাইজেশনের প্রথম শর্ত হচ্ছে দেশের সম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থাটি অত্যন্ত উন্নত করা। যদি আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থা লক্ষ করি, তাহলে সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট বিপ্লবের একটি প্ল্যাটফর্ম দেখতে পাব। বাংলাদেশে বিভিন্ন সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট (এসএনএস) রয়েছে যেখানে মানুষ ব্যবহার করছে অ্যাকাউন্ট। সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোর মধ্যে রয়েছে- facebook, messenger, google, instagram, linkedln, pinterest, tumbler, snapchat, twitter, viber, wechat, whatsApp, youtube ইত্যাদি। বেশির ভাগ লোকেরা তাদের সেলফোনের মাধ্যমে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটটি ব্যবহার করে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের আধুনিক জীবনে এক নতুন বাস্তবতা। গ্রামের চায়ের দোকানে মানুষ তথ্যের জন্য এখন আর পত্রিকার পাতা ঘাঁটাঘাঁটি করে না। তার বদলে এসেছে স্মার্টফোন ও আইফোন নির্ভরতা। সারা বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ৭০ শতাংশ মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংযুক্ত রয়েছে। তরুণদের মধ্যে এ হার আরও বেশি, প্রায় ৯০ শতাংশ। বাংলাদেশে যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ মানুষের রয়েছে ফেসবুক । আগস্ট ২০১৭-এর হিসাব অনুযায়ী সারা বিশ্বে ফেসবুক ব্যবহারকারীদের সংখ্যা প্রায় ২০৪ কোটি ৭০ লাখ। গবেষণায় দেখা গেছে, আমেরিকায় ৮৪ শতাংশ বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের জরিপ অনুযায়ী ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চল মিলিয়ে প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ মানুষ সক্রিয়ভাবে ফেসবুক ব্যবহার করছে (সূত্র : দৈনিক বণিক বার্তা, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭)। বিশ্বব্যাপী ইউটিউব ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা ১৫০ কোটি, হোয়াটসঅ্যাপ ১২০ কোটি, ফেসবুক মেসেঞ্জার ১২০ কোটি ও উইচ্যাট ব্যবহারকারী ৯৩ কোটি ৮০ লাখ (আগস্ট ২০১৭, সূত্র : ইন্টারনেট)।

বিশ্বের অসংখ্য মানুষ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট বিভিন্নভাবে আমাদের সমাজে প্রভাব ফেলে। সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোর যেমন: ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটগ্রাম, লিঙ্কডইন, স্কাইপ, ফ্লিকার ইত্যাদি উন্নয়নের সাথে সাথে আমাদের আধুনিক জীবনধারারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এসএনএস ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন মানুষ উপকৃত হয়েছে অন্যদিকে এর কিছু নেতিবাচক প্রভাব ও রয়েছে।

সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলির নেতিবাচক প্রভাব

কিশোর-কিশোরীর উপর প্রভাব

সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট ব্যাপকভাবে কিশোরদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। সামাজিক মিডিয়া সবচেয়ে খারাপ প্রভাব হল আসক্তি যা ক্রমাগত ফেসবুক, টুইটার বা অন্যান্য সামাজিক মিডিয়া চেক করার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এবং যা কোন এক পর্যায়ে মানুষের মস্তিষ্কে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। শিশু বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে কিছু কিশোর-কিশোরীরা ফেসবুক বিষণ্নতায় ভোগে। ফেসবুক এবং অন্যান্য জনপ্রিয় নেটওয়ার্কিং সাইটে দীর্ঘ সময় ব্যবহারের ফলে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে এবং বিষণ্নতায় ভোগে। তারা বাস্তব জীবনের চেয়ে ভার্চুয়াল জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বর্তমান সময়ে দেখা যায়, বাচ্চারা কোন কিছু করার চেয়ে টেলিভিশন বা কম্পিউটারে বেশি সময় অতিবাহিত করছে। সাম্প্রতিক সময়ে কিশোরদের জন্য প্রধান যে সমস্যা ঘটেছে তা হল Cyber bullying।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আর একটা ক্ষতিকর দিক হল কিশোর-কিশোরীদের কাছে পর্নোসাইট উন্মুক্ত হয়ে পড়া। সহজেই তারা প্রাপ্তবয়স্কদের সাইটে ঢুকতে পারে যা তাদের অপরিপক্ব মানসিকতায় ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। বাংলাদেশ সরকার অনুমান করে যে, বাংলাদেশের মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারী জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই ফেসবুক ব্যবহার করে, এবং প্রায় ৬০ ভাগ ব্যবহারকারীই ১৩ থেকে ২২ বছর বয়সী, যে বয়সটার কাছে সময়সীমার কোনো জ্ঞান বা মূল্য থাকে না। ফলে এই অভ্যাস আসক্তিতে পরিণত হয় সহজেই।

মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি

দীর্ঘ সময় সামাজিক নেটওয়ার্কিং ব্যবহারের ফলে ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। বেশি সময় এইগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা ও শারীরিক কসরতের অভাবে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কিডনি সমস্যা এবং বাস্তব জগতের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হবার কারনে মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়।

সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট অবৈধ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসার ক্ষতি

আধুনিক সভ্যতায়, সামাজিক প্রচার মাধ্যমের জন্য সামাজিক মিডিয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মানুষ তাদের অধিকাংশ সময়ই সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার করে কাটায়। বিভিন্ন সংস্থা তাদের পরিচিতির জন্য সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার করে থাকে। পূর্বে কোন সিনেমা বা গান মুক্তির জন্য সিডি বা ডিভিডি ব্যবহার করা হত কিন্তু বর্তমানে এর ব্যবহার নাই বললেই চলে। এ কারণে তাদের বিক্রি কমে যাচ্ছে। মুনাফার বেশিরভাগই দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়ার মালিক পেয়ে যায়। সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যবসা করছে অনেক ই-কমার্স সাইট। কিছু ব্যবহারকারীরা সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট এ তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন দেয় তারপর অন্য ব্যবহারকারীদের সাথে যোগাযোগ নম্বরের আদান প্রদানের মাধ্যমে পণ্য কেনাবেচা করে। এর ফলে বৈধ ই-কমার্স ব্যবসার ক্ষতি হয়।

গোপন তথ্য ফাঁস হওয়া

আমাদের সমাজে সামাজিক নেটওয়ার্কিং-এর নেতিবাচক প্রভাবের মধ্যে এটি সম্ভবত সর্বাধিক অপ্রীতিকর প্রভাব। হ্যাকাররা সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোকে টার্গেট করতে পছন্দ করে। কখনও কখনও তারা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বা অন্য কোন অ্যাপ্লিকেশানগুলির মাধ্যমে সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটে দূষিত কোড ঢোকায়। হ্যাকাররা ব্যবহারকারীদেরকে এমন সাইটগুলি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যবহার করতে পারে যা কোনও কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত তথ্য সরাতে পারে। টুইটার এই পদ্ধতির জন্য বিশেষত দুর্বল কারণ এখানে একটি পোস্ট পুনরায় পোস্ট করা সহজ, যাতে শেষ পর্যন্ত এটি শত শত লোকের দ্বারা দেখা যেতে পারে। এখানে ভিডিও বা ছবি ডাউনলোড করা এবং পোস্ট অনুলিপি করা খুব সহজ এবং কয়েকটি ক্লিকেই এটি করা যেতে পারে। হ্যাকাররা বিশেষ করে মেয়ে / নারীদের প্রোফাইল হ্যাক করে থাকে এবং তাদের হয়রানি করে থাকে। বর্তমানে, পুরুষরা ব্যাপকভাবে সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট ব্যবহার করছে নারীদের যৌন নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে। তারা সাধারণত ব্যক্তিগত মুহূর্তের ফটো / ভিডিওগুলি ধারণ করে রাখে এবং ছড়িয়ে দেয়।

সাইবার ক্রাইম

বাংলাদেশের মানুষের একটা অংশ অবৈধ উদ্দেশ্যে ফেসবুক ব্যবহার করে। ফেসবুক, একটি সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট, অপরাধীদের জন্য তাদের অপারেশন চালানোর জন্য একটি প্রধান ভিত্তি হয়ে উঠেছে। অনেক হ্যাকার আছেন যারা ফেসবুকে জাল অ্যাকাউন্ট খোলেন এবং অপমানজনক ছবি এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীদের কাছে জঘন্য তথ্য ছড়িয়ে দেন। তারা অন্যান্য ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি এবং যোগাযোগের তথ্য চুরি করে। কিছু অপরাধী ছবি তুলতে বা ফেসবুকে নারীদের ছবি সংগ্রহ করে এবং তারপর তাদের যৌন হয়রানির জন্য ফেসবুকে পর্নোগ্রাফিক সামগ্রী প্রকাশ বা বিতরণ করার জন্য ব্লগ লেখেন। এর ফলে আক্রান্ত অনেকে শিকার করতে বিব্রত বোধ করেন এবং অনেকে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে ওঠে। আবার অনেক ব্যক্তি এর প্রতিবাদও করে থাকে। বর্তমানে সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট ব্যবহার করে অনেক অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। সামাজিক মিডিয়া সম্পর্কে জ্ঞান থাকার অভাবের কারণে এটি ঘটে।

মানুষের আচরণের উপর সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটের প্রভাব

সোশ্যাল মিডিয়া যেমন- ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তিরা তাদের অনুভূতি, ছবি ও নানা কর্মকান্ড অন্যদের সাথে শেয়ার করে। অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে অনেক ব্যক্তি সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। দৈনিক চার ঘণ্টার বেশি সময় যদি কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিবাহিত করে তাহলে তার কোন কাজে আগ্রহ থাকবে না। ফেসবুকের লাইক বা মন্তব্য মানুষের আত্মসম্মানকে একদিকে যেমন বাড়িয়ে দেয় অন্যদিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস কমে যেতে পারে, অন্যদের সম্পর্কে তার ধারণা ও পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।

সম্পর্কের উপর সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটের প্রভাব

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া তার ব্যবহারকারীদের সম্পর্ককে নানাভাবে প্রভাবিত করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, সঙ্গীর ঈর্ষাপরায়ণ মনোভাব, অতিরিক্ত নজরদারি ইত্যাদির কারণে ফেসবুক রোমান্টিক সম্পর্কের জন্য ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফেসবুকে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে সেই ব্যক্তি রোমান্টিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঈর্ষাপরায়ণ থাকে এবং তার মধ্যে তাদের সঙ্গীর ফেসবুক প্রোফাইল নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা কাজ করে। সোশ্যাল মিডিয়া সামাজিক বৈষম্য তৈরি করার জন্য ও দায়ী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সমাজে ধনী-দরিদ্রের মাঝে ব্যবধান তৈরি করে। হতদরিদ্র ও দরিদ্র জনসাধারণ সোশ্যাল মিডিয়ার সুবিধা গ্রহণ করতে অক্ষম। যাদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের দক্ষতা আছে তারা চাকরি, প্রভাবশালীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং নিজ এলাকায় সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ বেশি পেয়ে থাকে।

সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত

- আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় যে তথ্য দিচ্ছেন সে ব্যাপারে সচেতন হন। অন্তর্জালে দেয়া ছবি বা ভিডিও আজীবনের জন্য রয়ে যেতে পারে এবং হ্যাকাররা এ ছবি বা ভিডিও নিয়ে তার অপব্যবহার করতে পারে।
- সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটে পরিচিত হওয়া বন্ধু বান্ধবের সাথে বাস্তব জীবনে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করবেন।
- ব্যক্তিগত স্পর্শকাতর তথ্য সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটে দিবেন না।
- যেসব অ্যাপ্লিকেশন তথ্য পাচার করে বা নজরদারি করে সেগুলোকে বন্ধ করে দিন।
- মনে রাখবেন, আপনার দেয়া প্রতিটি পোস্ট, মন্তব্য অন্তর্জালে থেকে যেতে পারে এবং ভবিষ্যতে আপনার ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- অপরিচিত কেউ সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চাইলে সে ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করবেন।
- যত বেশি মানুষ, তত বেশি সময় নষ্ট। তাই একটু ভেবে দেখুন এই মানুষটি আপনার জীবনে কোন ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে কি না। যদি উত্তরটি 'না' হয় তবে "ডিলিট ফ্রেন্ড" বা "আনফলো" চেপে দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণের দিকে এগিয়ে যান।
- যেসব সাইটে বয়স যাচাই করে না এবং সবাইকে নির্বিচারে ব্যবহার করতে দেয় সেসব সাইট থেকে দূরে থাকবেন।
- আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটে বিচরণের সময় সংক্ষিপ্ত করবেন। মনে রাখবেন, সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটে আমাদের জীবনের কেবল ছোট একটা অংশ ফুটে ওঠে এবং আমরা সর্বদা ভাল দিকটাকেই তুলে ধরি। সুতরাং সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটে পোস্ট দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া বা অনুকরণ করাটা বোকামি।

আত্মহত্যা নয়, চাই জীবনের জয়গান

সৈয়দা সারা নাসির
মাস্টার্স (স্কুল সাইকোলজি, ৩য় ব্যাচ)
মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতি ৪০ সেকেন্ডে কেউ না কেউ আত্মহত্যা করে থাকে। এই ৪০ সেকেন্ড মানে ঠিক কতটুকু সময় সে সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়ার জন্য বলতে পারি, আপনারা এই লেখাটা পড়ে শেষ করতে করতে প্রায় ১৫ জন মানুষ তাদের নিজেদের জীবন দিয়ে দিবে। পর্যাপ্ত পরিসংখ্যানের অভাব থাকলেও এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে আত্মহত্যা বিশ্বব্যাপী একটি গুরুতর জন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা।

আত্মহত্যা বা সুইসাইড কি তা হয়তো সহজ বাংলায় প্রায় সবাই বলতে পারবো। আত্মহত্যা বা আত্মহনন (ইংরেজি: Suicide) হচ্ছে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়া বা স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণনাশের প্রক্রিয়া বিশেষ। ল্যাটিন ভাষায় "সুই সেইডেয়ার" থেকে আত্মহত্যা শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে নিজেকে হত্যা করা। আমরা প্রায় প্রতিদিনই পত্রিকা, টেলিভিশন কিংবা অনলাইনে আত্মহত্যার খবর পড়ি। খুব মন খারাপ করে ভাবি "কেন মানুষটা আত্মহত্যার মতো কাজটা করল?" "কী চলছিল তাঁর মনে?" কিন্তু আমরা নিজেরা এই বিষয় নিয়ে খুব কম কথা বলি। বেশিরভাগ সময় আমরা এই বিষয়টি এড়িয়ে যাই। কিন্তু এড়িয়ে যাওয়ার ফলে কি আত্মহত্যার হার কমে যাচ্ছে? মোটেই না। বরং বিভিন্ন কারণে মানুষের আত্মহত্যা প্রবণতা বেড়েই চলছে প্রতিদিন।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশিত প্রতিবেদন (২০১৯) অনুযায়ী, প্রতিবছর প্রায় ৮ লাখ মানুষ আত্মহত্যা করে এবং প্রতিটি আত্মহত্যার জন্য ২০ বারের বেশি প্রচেষ্টা করার সম্ভাবনা রয়েছে। আত্মহত্যার ৭৯% ভাগ স্বল্প আয়ের এবং মাঝারি আয়ের আর্থ-সামাজিক পরিবারে ঘটে। বিশ্বে আত্মহত্যা ১৫-২৯ বয়সীদের জন্য একটি তৃতীয় শীর্ষ কারণ। ২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা "Suicide Prevention: A Global Imperative" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যাতে বলা হয়েছে প্রতি ১ লাখে প্রায় ৮ জন ব্যক্তি আত্মহত্যা করে বাংলাদেশে এবং এই দেশ ১০ম স্থানে রয়েছে বৈশ্বিক তালিকায়। বেশির ভাগ এশিয়ার দেশগুলির বিপরীতে বাংলাদেশে পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেশি। আমাদের দেশে সামগ্রিকভাবে যদিও এখনো পর্যাপ্ত গবেষণা নেই, তারপরও বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে আত্মহত্যার হার বেড়েই চলছে।

মানুষ কেন আত্মহত্যা করে বা করতে চায়?

আত্মহত্যার প্রধান উদ্দেশ্য মারা যাওয়া নয় বরং কোন একটি কষ্ট বের করে দেওয়ার তীব্র ইচ্ছা। একজন আত্মহত্যাপ্রবণ মানুষের মাঝে থাকে একরাশ হতাশা, একাকীত্ব, অসহায়ত্ব এবং অপূরণীয় অনিশ্চয়তা। বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াকেই যখন সহজ মনে হয়, যখন মনে হয় আর কোন উপায় নেই সমস্যা সমাধানের, ঠিক এরকম পরিস্থিতিতেই একজন মানুষ আত্মহত্যার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আত্মহত্যার সাথে সম্পর্কিত ৩টি মূল ঝুঁকিপূর্ণ কারণ রয়েছেঃ জৈব-মনোসামাজিক কারণ, পরিবেশগত কারণ এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ।

জৈব-মনোসামাজিক কারণঃ জৈব-মনোসামাজিক কারণগুলো হচ্ছে বিভিন্ন মানসিক রোগ যেমন মুড ডিসঅর্ডার, সিজোফ্রেনিয়া, পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার, অ্যালকোহল বা বিভিন্ন সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ ডিসঅর্ডারসমূহ ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে হতাশা, আবেগ প্রবণতা, আক্রমণাত্মক প্রবণতা, কোন বড় ধরণের শারীরিক অসুস্থতা, পরিবারের মধ্যে আত্মহত্যার ইতিহাস।

পরিবেশগত কারণঃ পরিবেশগত কারণগুলো হচ্ছে কর্মহীনতা, বেকারত্ব, আর্থিক সমস্যা, স্কুল, কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ড্রপ আউট হওয়া, প্রেমে ব্যর্থতা বা প্রতারণার শিকার, যৌন নির্যাতন, পারিবারিক কলহ, যৌতুক, দাম্পত্য সমস্যা ইত্যাদি। বাংলাদেশে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, পারিবারিক সমস্যা (৪১.২%),

পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া (১১.৮%), বৈবাহিক সমস্যা (১১.৮%), ভালোবাসায় কষ্ট পাওয়া (১১.৮%), বিবাহবহির্ভূত গর্ভধারণ ও যৌন সম্পর্ক (১১.৮%), স্বামীর নির্যাতন (৫.৯%) এবং অর্থকষ্ট (৫.৯%) থেকে রেহাই পেতে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণঃ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণগুলো হচ্ছে সামাজিক সহায়তার অভাব, বিচ্ছিন্নতাবোধ, হেল্প-সিকিং আচরণের সাথে জড়িত সম্মানহানিকর ধারণা, স্বাস্থ্যসেবা বিশেষত মানসিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে বাধা, কিছু নির্দিষ্ট সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাস, মিডিয়ার মাধ্যমে এবং আত্মহত্যার ফলে মারা যাওয়া অন্য ব্যক্তির প্রভাব পড়া ইত্যাদি। আত্মহত্যার নির্দিষ্ট কোন বয়স নেই। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষই আছে আত্মহত্যার ঝুঁকিতে।

বাংলাদেশে আত্মহত্যা করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তবে, সচরাচর ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে বিষ পান, ফাঁসি, অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ একত্রে সেবন, চলন্ত যানবাহনের নিচে লাফ দেওয়া, কীটনাশক পান, হাত বা পায়ের রগ কেটে ফেলা, উঁচু থেকে লাফ দেওয়া ইত্যাদি।

আত্মহত্যার প্রক্রিয়া

আত্মহত্যার প্রক্রিয়ায় আত্মহত্যার চিন্তা মাথায় আসার পর ব্যক্তি একটি চক্রের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আত্মহত্যা করার দিকে ধাবিত হয়। ব্যক্তির মধ্যে আত্মহত্যার চিন্তা আসার পর একই চিন্তা ঘুরপাক খায়। ব্যক্তি ওই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে পারে না, যা তাঁর প্রতিদিনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, পেশাগত, শিক্ষা সংক্রান্ত সহ সব ধরনের কাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। সব ধরণের কার্যক্রম প্রভাবিত হওয়ার ফলে ব্যক্তির মধ্যে আত্মহত্যার চিন্তা জোরালো হয়। সে ভাবতে থাকে, তাঁর আর বেঁচে থেকে কী লাভ? এই ভাবনা থেকে তাঁর আত্মহত্যার চিন্তাকে জোরালো করে। ফলে, ব্যক্তি আত্মহত্যার পরিকল্পনা করে। একসময় ব্যক্তি আত্মহত্যার চেষ্টা করে ফেলে। যারা একবার আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করে তারা আর আত্মহত্যার চেষ্টা করবে না বলে অনেকে মনে করলেও আসল চিত্র ভিন্ন। আত্মহত্যার প্রক্রিয়াটিকে নিচের চিত্রে তুলে ধরা হলো।

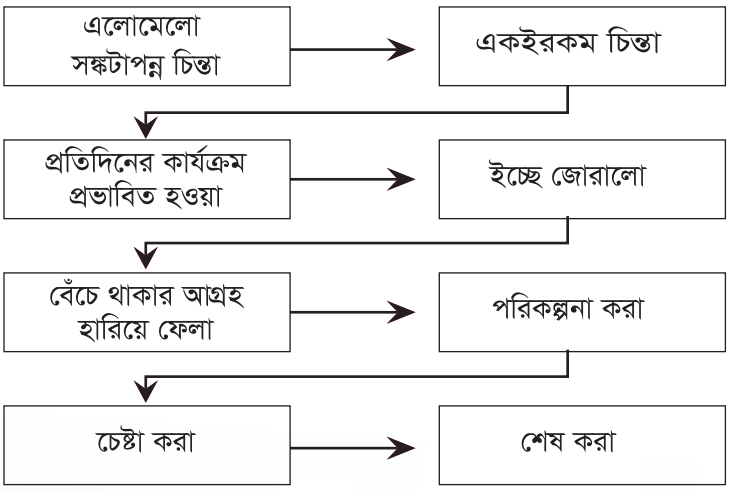

আত্মহত্যার পরিকল্পনার মনোবৈজ্ঞানিক মডেল

আত্মহত্যার সতর্কসংকেত

অধিকাংশ মানুষ যারা আত্মহত্যার চিন্তা করে তারা সত্যিকার অর্থে মরতে চায় না। তারা একটি কঠিন সমস্যায় পড়ে এবং তার সমাধানের কোন পথ না পেয়ে আত্মহত্যাকে বেছে নেয়। একজন মানুষ যখন মানসিকভাবে খারাপ থাকে কিংবা কোন সমস্যায় পড়ে, এরকম সময়ে তিনি কোন না কোনভাবে সংকেত দেয় যে তাঁর জীবনে কিছু একটা ঠিক হচ্ছে না, তিনি ভাল নেই। যারা আত্মহত্যা করার চিন্তা করে, তারা সবসময়ই তাঁদের আচরণে এরকম কিছু লক্ষণ প্রকাশ করে। এই লক্ষণ সমূহকে সতর্ক সংকেত বলা হয়। একটা মানুষ কতখানি আত্মহত্যার ঝুঁকিতে আছে তা এই প্রাথমিক সংকেত থেকে নির্ধারণ করা যায়। একারণে আত্মহত্যার সতর্ক সংকেতগুলো সম্পর্কে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিলেই কেবল আত্মহত্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

- ব্যক্তি যখন মারা যাবে, সবার থেকে অনেক দূরে চলে যাবে এমনটা বলতে শুরু করে।
- সবার থেকে ক্ষমা চায়।
- বিদায় চায়।
- আত্মহত্যার পরিকল্পনার কথা বলে।
- আত্মহত্যার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী জোগাড় করে।
- যদি কেউ আত্মহত্যা কীভাবে করবে, তার অনুশীলন বা রিহার্সেল করে ও আত্মহত্যা করার সাহস বাড়াতে চায়।
- ঘুম ও খাওয়া-দাওয়া কমে/বেড়ে গেলে, আচার-আচরণে সাংঘাতিক পরিবর্তন ঘটলে তা ঝুঁকি নির্দেশক হতে পারে।
- নিজের চেহারা ও পোশাক-আশাকের সৌন্দর্যের বিষয়ে অসচেতন হয়ে ওঠে।
- আত্মবিশ্বাস কমে যায়।
- নিজেকে ঘৃণা করে। ঘনিষ্ঠজনদের দূরে ঠেলে দেয়। নিজেকে অন্যের ওপর বোঝা মনে করে।
- অধৈর্য হয়ে পড়ে। বিরক্তি বেড়ে যায়।
- কেউ কেউ ধূমপান বাড়িয়ে দেয়। অনেকে মদ্যপান বা নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ বাড়িয়ে দেয়।
- বড় ধরনের কোনো সমস্যার মাঝে পড়ে বলে সে আর পেরে উঠছে না। যেমন: প্রেমে ব্যর্থ হয়ে তীব্র মানসিক কষ্টে পড়ে গেলে।
- আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে এমন মানুষ। বিশেষত যদি আত্মহত্যার নোট লিখতে চেষ্টা করে থাকে, যদি এমন ভাবে চেষ্টা করে থাকে যাতে কেউ তার চেষ্টার বিষয়টি ধরতে না পারে, যাতে মৃত্যু নিশ্চিত হয় তাহলে।
- কারো নিজের ক্ষতি নিজে করার ইতিহাস থাকলে। যেমন: কেউ যদি নিজেকে নিজে আহত করে।
- জটিল দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ।
- বিষণ্নতা, বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার ইত্যাদি মানসিক রোগে আক্রান্ত হলে, বিশেষত আশাহীন হয়ে পড়লে।

কথাবার্তাঃ যারা আত্মহত্যার কথা চিন্তা করে তাঁদের বাক্যে বা কথায় হতাশা, নৈরাশ্য এমনকি সরাসরি মৃত্যুর কথা প্রকাশ পায়। যেমনঃ

- আমি আর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই না।
- অন্যের বোঝা হতে হতে আমি ক্লান্ত
- এগুলো আর ঠিক হবে না।
- আমাকে ছাড়াই সবাই ভালো থাকবে।
- আমি চলে গেলে কেউই আমার কথা মনে রাখবে না।
- যদি আমি মরে যেতে পারতাম।

- এই ঘুম যদি আর না ভাঙ্গতো!
- আমাকে কেউ ভালবাসে না।
- আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই।
- আমি আর কোন কষ্ট সহ্য করতে পারছি না।

আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তির সাথে করণীয়

যদি এরকম হয় যে আপনি কাউকে চিনেন বা জানেন যার মাঝে আত্মহত্যাপ্রবণতা আছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে তাৎক্ষণিকভাবে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে এবং ঐ ব্যক্তির সকল কথা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। প্রথমেই তাকে সরাসরি প্রশ্ন করতে হবে যে, সে আত্মহত্যার কথা ভাবছে কিনা অথবা কোন পরিকল্পনা করেছে কিনা আত্মহত্যা করার জন্য, যদি পরিকল্পনা করে থাকে তাহলে তা কিভাবে এবং কখন সে বাস্তবায়ন করবে বলে ভেবেছে। সবসময় মনে রাখতে হবে, কাউকে আত্মহত্যার প্রশ্ন করার মানে তার মাথায় আত্মহত্যার বীজ বপন করা নয়। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বরং এরকম সরাসরি প্রশ্ন করলে সে তার ভিতরের কথা বলার সুযোগ পাবে। সে অনুভব করতে পারবে কেউ একজন তার সমস্যা বা কষ্টের গভীরতা অনুভব করতে পেরেছে। এই স্তরের প্রত্যেকটা মুহূর্ত এবং আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একারণে সবসময় সচেতন থাকতে হবে যেন আপনার কথা বা কাজে কোনভাবেই ঐ ব্যক্তি কষ্ট না পায়। এই স্তরেই একজন মানুষ কতখানি আত্মহত্যার ঝুঁকিতে আছে তা নির্ধারণ করা যায় এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মহত্যা প্রতিরোধ করা যায়।

যদি কেউ আত্মহত্যার চেষ্টা করতে যাচ্ছে এরকম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে সেক্ষেত্রে কয়েক ধাপে আপনাকে এগোতে হবেঃ

- যদি সম্ভব হয় তাহলে অন্য কাউকে (পরিবারের কেউ হলে ভালো হয়) জানানো এবং তার সাহায্য নেয়া। কারণ এসময়ে একা সবদিক বিবেচনা করে কাজ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তাই কখনই একা একা সব করতে দেওয়া যাবে না।
- তাৎক্ষণিকভাবে প্রফেশনাল কারো সাহায্য নেয়া, যেমনঃ ডাক্তার, মনোবিজ্ঞানী, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ প্রমুখের সাথে আলাপ করা।
- অবশ্যই ব্যক্তিকে প্রাণঘাতী উপায় (যেমনঃ দড়ি, বিষ, স্যাভলন, ব্লেড, ছুরি, বন্দুক, হারপিক ইত্যাদি যা দিয়ে সে আত্মহত্যার পরিকল্পনা করেছিল) থেকে দূরে রাখতে হবে।

এখন কথা হলো আমি নিজেই যদি আত্মহত্যার ঝুঁকিতে থাকি বা আমার নিজেরই যদি আত্মহত্যার চিন্তা আসে তাহলে কী করব? আমার বা আপনার মধ্যে কখনো কখনো আত্মহত্যার চিন্তা আসতেই পারে। তখনও আমাদের কিছু কাজ করার আছে যার মাধ্যমে আমরা অন্যের সাহায্য ছাড়াও প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যাপ্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে পারি। এক্ষেত্রেও আমাদের কতগুলো ধাপে এগোতে হবেঃ

- সতর্ক সংকেতগুলো চিনতে শেখা।
- নিজের Internal Coping Strategy গুলোকে সক্রিয় করা, যার মাধ্যমে সহজে আত্মহত্যামূলক চিন্তা থেকে দূরে থাকা যায়।
- সামাজিক সম্পর্ক বাড়ানো এবং যারা আপনাকে সহায়তা করতে পারবে তাঁদের সাথে যোগাযোগ করা। এতে করে সংকটময় সময়টাতে মন অন্যদিকে সরানো সহজ হয়। একই সাথে অন্যরাও সাহায্য করার সুযোগ পাবে।

- পরিবার বা কাছের বন্ধুর সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলুন, যারা আপনাকে দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা দিতে পারবে এবং সংকটের মুহূর্তে সর্বক্ষণ আপনাকে খেয়াল রাখতে পারবে।
- পরিবেশ থেকে প্রাণঘাতী উপায়গুলো মুক্ত করা যাতে যখন-তখন আত্মহত্যার চেষ্টা না করা যায়।

স্কুল মনোবিজ্ঞানীদের করণীয়

স্কুল মনোবিজ্ঞানী হলেন সেই মনোবিজ্ঞানী যারা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শিশু ও তরুণদের আবেগিক, সামাজিক এবং একাডেমিক সমস্যাগুলিতে সহায়তা করার জন্য কাজ করেন। শিশুদের ও তরুণদের মধ্যে যাদের আত্মহত্যার প্রবণতা আছে তাঁদের ক্ষেত্রে স্কুল মনোবিজ্ঞানীরা নিচের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে সেবা প্রদান করে থাকেন।

- ❒ ইতিবাচক আচরণ ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন করা
- ❒ শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ ও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- ❒ শিক্ষার্থীদের আবেগীয় ও আচরণগত চাহিদা মূল্যায়ন করা
- ❒ সমবয়সীদের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করা
- ❒ পিয়ার হেল্পারদের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা
- ❒ আত্মহত্যা সম্পর্কে সচেতন করা ও সহযোগিতা করা
- ❒ শিক্ষার্থীদেরকে আত্মহত্যা বিষয়ক পাঠ্যক্রম প্রদান এবং জ্ঞান প্রদান করা
- ❒ আত্মহত্যা সম্পর্কিত কোন চিন্তা আসছে কিনা তা জানার জন্য সকল শিক্ষার্থীদেরকে স্ক্রিনিং করা
- ❒ আত্মহত্যাপ্রবণ শিক্ষার্থী এবং বিশেষ গোষ্ঠি (সংখ্যালঘু, হোমোক্সেসুয়াল, ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থী) সাথে কাজ করা
- ❒ দ্রুত চিকিৎসা এবং প্রয়োজনবোধে রেফার করে দেওয়া।
- ❒ নিরাপদ সুন্দর শিক্ষা পরিবেশ তৈরী
- ❒ শিক্ষণ চাহিদার ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য মূল্যায়ন করা
- ❒ শিক্ষা পরিবেশে সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রচার
- ❒ বুলিং ও উত্যক্তকরণ সহ সব ধরণের সহিংসতা রোধ করা
- ❒ প্রাণঘাতী উপকরণ সমূহের সহজলভ্যতা হ্রাস করার জন্য কাজ করা
- ❒ শিক্ষার্থীদের ঝুঁকিসমূহ ও শিক্ষা পরিবেশের দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করা
- ❒ আত্মহত্যাপ্রবণ শিশুদের শনাক্ত করতে স্কুল কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া
- ❒ পরিবারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা
- ❒ শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি নিয়মিত তদারক করা এবং তা বাবা-মা/অভিভাবকের সমীপে পেশ করা
- ❒ পরিবারকে তাঁর সন্তানদের শিক্ষণ ও মানসিক স্বাস্থ্য বুঝতে সাহায্য করা
- ❒ শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরিবারকে কার্যকরভাবে যুক্ত করা চাই না আর কার জীবন চলে যাক নিজের ইচ্ছাতেই, চাই আত্মহত্যার নামটি মুছে যাক জীবন থেকে, সমাজ থেকে এবং গোটা দেশ থেকে। আমরা সবাই যদি যার যার জায়গা থেকে একটু সচেতন হই, তাহলে পারবো একটি মানুষের জীবনকে বাঁচাতে, পারবো তাঁকে একটি সুন্দর জীবন উপহার দিতে।

কোন কারণ ছাড়াই সবসময় রাগান্বিত?

রওনক জাহান জুই
মাস্টার্স (স্কুল সাইকোলজি, ৪র্থ ব্যাচ)
মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হতে পারে প্রতিনিয়তই আপনি রাগান্বিতবোধ করেন, আপনি খিটখিটে, বদমেজাজি এবং বদরাগী। হতে পারে আপনি অল্পতেই আশেপাশের সবার উপর বিস্ফোরিত হয়ে পড়েন বা হতে চান- কারণ আপনার ভেতর সুনামীর মত প্রবল বেগে রাগ অনুভূত হয়। অথচ আপনি জানেনই না এমন অনুভূতি হওয়ার কারণ কি!

এর একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে আপনার চারপাশে যে সীমানা রয়েছে তা দুর্বল। অর্থাৎ আপনি প্রায় সময়ই তখন "হ্যাঁ" বলেন যেই মুহূর্তে আপনি মন থেকে খুব করে চান "না" বলতে। আপনি আরেকজনকে খুশি রাখার জন্য এমন কিছু করেন যা করতে আপনি মোটেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। যার ফলে আপনি প্রতিনিয়তই আত্মশক্তি হারাচ্ছেন এবং শূন্যতা অনুভব করছেন। কিন্তু আপনি হয়তো সঠিকভাবে এই বিষয়গুলোর মাঝে সমন্বয় করতে পারছেন না। আপনি ভাবছেন মানুষ আপনার সুযোগ নিচ্ছে কিন্তু আপনি এটা বুঝতে পারছেন না এর মধ্যে আপনার নিজেরও অংশগ্রহণ রয়েছে।

রাগের অনুভূতি সৃষ্টি হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে। হতে পারে আপনি প্রয়োজন মত ঘুমাতে পারছেন না বা আপনি কাজের মাঝে হারিয়ে গেছেন। যা আপনার আবেগের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা উপলব্ধি করা কঠিন করে ফেলে।

হতে পারে এটি হতাশা। Hanks বলেন, হতাশা সম্পর্কে অনেকেরই একটি ভুল ধারণা আছে যে হতাশা মানেই সবসময় কান্নাকাটি করা বা বিছানা থেকে না উঠে সবসময় শুয়ে থাকা ইত্যাদি বোঝায়। কিন্তু প্রতিনিয়ত খিটখিটে স্বভাব বেড়ে যাওয়াও হতাশার সাধারণ লক্ষণ।

হতে পারে এটি দুশ্চিন্তা। যারা অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করেন তারা প্রায়ই দমবন্ধকর অবস্থা অনুভব করেন কারণ তাদেরকে সবসময়ই নিজের ভেতরের আবেগীয় অবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্ব সামলাতে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

সাইকোথেরাপিস্ট Rebecca Wong, LCSW বলেন,অনেক দম্পতি সর্বদা রাগান্বিত থাকেন সম্পর্কজনিত সমস্যার কারণে। দেখা যায়,তারা তাদের জীবনসঙ্গী, সন্তান, বাবা-মা, বন্ধু এবং সহকর্মীদের সাথে রাগ করে থাকেন। হতে পারে এর কারণ তারা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে শূন্য অনুভব করেন বা তাকে কেউ গুরুত্ব দেয় না এমন মনোভাব রাখেন।

অনেকেই আশা করে থাকেন তাদের ঘনিষ্ট বন্ধুরা তাকে সাহায্য করবে কিন্তু,আশানুরূপ সাহায্য পান না। হতে পারে অনেকেই জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে আশা করেন যে,সে আরো বেশি সময় দিবে এবং সাহায্য করবে। এই বিষয়গুলো যখন আশানুরুপ না হয়ে প্রতিনিয়ত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে এবং ব্যক্তিকে শেষ পর্যায়ে নিয়ে আসে তখন এর বহিঃপ্রকাশ প্রচণ্ড রাগের মাধ্যমে ঘটে।

Michelle Farris বলেন, অনেক সময় আমরা যখন এমন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করি যা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে তখন আমাদের মাঝে প্রচণ্ড রাগের উদ্ভব হয়।

মাঝে মাঝে আপনি রাগান্বিতবোধ নাও করতে পারেন কিন্তু তার পরিবর্তে এমন কিছু আচরণ করলেন যা আক্রমণাত্মক এবং বিরক্তিবোধের সৃষ্টি করে।

আমাদের সমাজে সর্বদাই একটা বিষয় শেখানো হয় যে, দ্বন্দ্ব এড়াতে এমন বিষয় গুলোতে "হ্যাঁ" বলা যে বিষয়ে আমরা মন থেকে "না" বলতে চাই। আমরা বেশিরভাগ সময়ই নিজেদের অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে নিজেদের সাথেই সংগ্রাম করে থাকি কারণ রাগ প্রকাশ করাকে নিষিদ্ধ বলে মনে করা হয়। রাগ প্রকাশ করতে সবসময়ই আমরা ভয়ে থাকি আরেকজন যেন কষ্ট না পেয়ে বসে অথবা আমরা নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারি।

Farris রাগ নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করার জন্য কিছু পরামর্শ দিয়েছেনঃ

১। আপনার রাগের প্রাথমিক লক্ষণ সম্পর্কে সচেতন থাকুন যা বিভিন্ন জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে।
২। আরেকজনকে দোষ না দিয়ে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করার চেষ্টা করুন।
৩। প্রতিকূল পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।
৪। উত্তেজিত মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে গভীর নিঃশ্বাস নিন।
৫। যেসকল নেতিবাচক বিষয় আপনাকে বিরক্ত করে সেগুলোর প্রতি খেয়াল রাখুন।
৬। সমস্যাবোধ করলে অন্যের কাছে সাহায্য চান।
৭। যখন কোনো সমস্যা ধীরে ধীরে বেড়েই চলে তখন কিছু সময়ের জন্য বিরতি নিয়ে পরে আবার আলোচনা করুন।

রাগ হলো হতাশা ও বিরক্তির মধ্যবর্তী একটি আবেগ। Hanks এর মতে, রাগ মানেই হিংস্র আচরণ নয়। আমরা সাধারণত রাগ বলতে এটাই বুঝে থাকি, যা একটি ভুল ধারণা। রাগ হলো গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যকীয় অনুভূতি। রাগের কারণ সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং এই সচেতনতা অন্তর্নিহিত দুর্বল অনুভূতির বিরুদ্ধে কাজে লাগানোই হলো মানসিক স্বাস্থ্যের চাবিকাঠি।

মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ

নূরজাহান খাতুন কেয়া
মাস্টার্স (স্কুল সাইকোলজি, ৩য় ব্যাচ)
মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুক্তরাষ্ট্রের একজন শিক্ষক বলেছেন, একজন শিশুর শিক্ষার সাথে তিনটি প্রধান উপাদান জড়িত। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও মাতা-পিতা। মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ এমন একটি সংস্থা যার মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও মাতা-পিতার মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। মোটিভেশনাল স্পিকার হেলেন কেলার বলেন, "Alone we can do little, together we can do much." এছাড়াও মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ শিক্ষক ও মাতা-পিতাকে একত্রে কাজ করার সেই সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়, যার মাধ্যমে বাড়ি ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। ফলস্বরূপ বিদ্যালয় শিশুর জন্য একটি সুন্দর ও আনন্দদায়ক স্থান হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ কী ?

মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ এমন একটি সংস্থা যা মাতা-পিতা ও শিক্ষক নিয়ে গঠিত হয়, যেটার লক্ষ্য হল বিদ্যালয়ে মাতা-পিতার অংশগ্রহণকে সহজতর ও বৃদ্ধি করা।

মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘের উদ্দেশ্য:

১। বাড়ি, বিদ্যালয় ও কমিউনিটিতে শিশুদের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করা।
২। আমাদের শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষার জন্য আইনের বিধান নিশ্চিত করা।
৩। শিশুর বাড়ি ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। যাতে করে মাতা-পিতা ও শিক্ষকরা শিশুর শিক্ষায় সহায়তা করতে পারে।
৪। মাতা- পিতা ও শিক্ষক সংঘের মাধ্যমে মাতা-পিতাকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা শেখাতে সাহায্য করা হয়। যাতে করে তারা শিশুর সুরক্ষা দিতে পারে এবং শিশুকে উন্নত মানুষ হিসেবে সমাজে গড়ে তুলতে পারে।
৫। মাতা- পিতা ও শিক্ষক সংঘের মাধ্যমে মাতা-পিতা ও সাধারণ জনগণকে উৎসাহিত করা হয়। যাতে করে তারা বিদ্যালয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়।
৬। এছাড়া মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘের মাধ্যমে শিক্ষাবিদ ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। যাতে করে তাদের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশুরা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক শিক্ষায় সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে পারে।

মাতা- পিতা ও শিক্ষক সংঘ উৎপত্তির ইতিহাস:

আজ থেকে প্রায় ১২২ বছর আগে ১৮৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের National Congress of Mothers সম্মলনে ২,০০০ মাতা-পিতা, শিক্ষক, শ্রমিক ও আইন প্রণেতার উপস্থিতিতে মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ গড়ে তোলা হয়। এ সংঘ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন Alice Mc Lellan Birney এবং Phoebe Apperson.

মাতা- পিতাও শিক্ষক সংঘ কেন দরকার?

☛ মাতা- পিতা ও শিক্ষক সংঘ একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে একজন শিক্ষকের যেমন সুযোগ থাকে শিশুর আগ্রহ, দক্ষতা, সামাজিক ও পারিবারিক বিষয় সম্পর্কে জানার অনুরূপভাবে মাতা-পিতাও জানার সুযোগ থাকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকরা শিশুর জন্য কি করছে সে বিষয়ে অবগত হওয়ার।

- মাতা- পিতা ও শিক্ষক সংঘের মাধ্যমে মাতা-পিতা বিদ্যালয়ের কার্যক্রম, সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারে এবং বুঝতে পারে কীভাবে তাদের সামান্য সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ বিদ্যালয়কে এ সমস্যা থেকে বের করে আনতে সাহায্য করে।
- একজন শিক্ষার্থী তার দিনের মাত্র ১৭ ভাগ সময় বিদ্যালয়ে থাকে এবং বাকি ৮৩ ভাগ সময় সে বাড়ি ও কমিউনিটিতে অতিবাহিত করে। এ বিষয়কে মাথায় রেখে মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ একজন শিশুর শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের জীবনকে উন্নত করার চেষ্টা করে না, পাশাপাশি শিশু যাতে বাড়ি ও কমিউনিটি জীবনেও উন্নতি লাভ করতে পারে সে চেষ্টা করে। এছাড়া একজন শিক্ষার্থী যেন মানসিক ও শারীরিক ভাবে তার নিজস্ব ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে সে বিষয়েও সাহায্য করে।
- এছাড়াও শিশু যাতে সমাজে একজন সুশিক্ষিত এবং সামাজিক ভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সে চেষ্টাও করে মাতা-পিতা ও শিক্ষকসংঘ। এছাড়া আরো অনেক দায়-দায়িত্ব মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ কার্যকর ভাবে সম্পাদন করে থাকে।
- অনেক সময় দেখা যায়, কিছু শিক্ষার্থী আর্থিক সংকটের কারণে তাদের পড়াশোনাকে চালিয়ে নিতে পারেনা। এ ক্ষেত্রে মাতা- পিতা ও শিক্ষক সংঘের এর মাধ্যমে একটা ফান্ড গঠন করা হয়, যাতে করে অভাবগ্রস্থ শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেতে পারে।
- মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বইয়ের বাহিরের বিভিন্ন বিষয়ের দক্ষ ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যাতে করে শিশুরা উপকৃত হয়। আবার কখনো কখনো শিল্পীকেও আমন্ত্রণ জানানো হয় স্টেজ পারফরমেন্সের জন্য। যাতে করে শিশুরা একাডেমিক জ্ঞানের পাশাপাশি সৃজনশীল কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারে এবং নিজেদের দক্ষতাকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারে।
- এছাড়া মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘের মাধ্যমে ডেডিকেটেট শিক্ষকদেরকে তাদের কর্মের জন্য প্রশংসা ও উৎসাহিত করা হয়। যার ফলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে ভালো করার চেষ্টা করে।

মাতা- পিতা ও শিক্ষক সংঘ সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজের ফলাফল

মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘের উপর বিভিন্ন ধরণের গবেষণা মূলক কাজ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, যখন শিশুর শিক্ষা ক্ষেত্রে মাতা-পিতা অংশগ্রহণ থাকে, তখন তাদের মানসিক বিকাশ ভাল হয়। বিগত ৩০ বছরের ৮৫ টা Literature review করে দেখা গেছে, যখন মা-বাবা শিশুর লেখাপড়ার তদারকি করেন তখন তাদের পরীক্ষার ফলাফল ভাল হয়, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়ে, একাডেমিক পারফরমেন্স এবং উচ্চশিক্ষার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। White & Kelly (2010) একটা গবেষণায় পেয়েছেন যে, শিশুর শিক্ষায় মাতা-পিতা জড়িত থাকলে বিদ্যালয়ে শিশুর ঝরে পড়া প্রতিরোধ করা সম্ভব। আরেকটি গবেষণায় Burkle (2009) Rashly & Christenson(2012) পেয়েছেন যে, শিক্ষার্থীর সামাজিক, একাডেমিক এবং আচরণগত দিক উন্নত করতে মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। স্কটল্যান্ডের (২০১৫) একটি গবেষণায় দেখা গেছে, একটি শিক্ষণ উপযোগী বাড়ির পরিবেশ সকল শিশুর জ্ঞানের উন্নতি সাধনে সাহায্য করে। তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা যেমনই হোক না কেন।

মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ থেকে শিক্ষার্থীরা যেসব সুবিধাদি পায়

যখন মা-বাবা শিক্ষকের পাশাপাশি শিশুর শিক্ষণে সহযোগিতা করে, তখন একজন শিশু শুধু তার বিদ্যালয়েই সফল হয় না বরং সে তার জীবনব্যাপী সফল হতে পারে। মাতা-পিতা ও শিক্ষকসংঘ থেকে শিশুরা যেসব সুযোগ-সুবিধাদি পায়:

১। শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিশু মাতা-পিতা ও শিক্ষক উভয়ের সাহায্য ও সহযোগিতা পায়। ফলে বিদ্যালয়ে তাদের উপস্থিতির হার বাড়ে।

২। তাদের একাডেমিক পারফরমেন্স বাড়ে।

৩। স্কুলের কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ বাড়ে।

৪। শিশুর মধ্যে বাড়ির কাজ সম্পন্ন করার প্রবণতা বাড়ে।

৫। তাদের মধ্যে বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে ইতিবাচক ব্যবহার করার প্রবণতা বাড়ে।

৬। তাদের মধ্যে ভাল সামাজিক দক্ষতা গড়ে ওঠে এবং স্কুলে অভিযোজনের ক্ষমতা বাড়ে।

৭। শিক্ষার্থীর কাজের প্রতি প্রেষণা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ থেকে মাতা-পিতা যেসব সুবিধাদি পায়

১। মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘের কারণে মাতা-পিতা নিয়মিত ভাবে শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করেন। এতে করে মাতা-পিতা ও শিক্ষকদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

২। নিয়মিত যোগাযোগের দরুণ মাতা-পিতা স্কুলের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন, শিক্ষকদের কার্যক্রম সম্পর্কেও জানতে পারেন। এতে করে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার প্রতি তাদের ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে।

৩। শিশুর কোন নেতিবাচক আচরণগত সমস্যা থাকলে শিক্ষকরা তা চিহ্নিত করে মা-বাবাকে জানাতে পারেন। এতে করে দ্রুত এ আচরণকে ইতিবাচক আচরণে পরিণত করার জন্য মা-বাবা কার্যকর ভাবে রেসপন্স করতে সক্ষম হন। যাতে করে শিশুর আচরণগত সমস্যা দ্রুত দূর করা যায়।

৪। মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘের কারণে মাতা-পিতা শিশুর সক্ষমতা, শক্তিশালী ও দুর্বল দিক, শিশুর সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে পারেন। ফলে তারা শিশুর সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে শিশুর কাছ থেকে পারফরমেন্স প্রত্যাশা করতে পারেন। কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বা অবাস্তব ফল প্রত্যাশা করেন না।

৫। অন্যান্য মাতা-পিতার সাথে তাদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে অন্যান্য শিশুর মাতা-পিতার সাথে তাদের শিশুর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ থেকে শিক্ষকরা যেসব সুবিধাদি পায়:

১। মাতা- পিতা ও শিক্ষক সংঘের মাধ্যমে শিক্ষকদেরকে তাদের কাজের জন্য উৎসাহিত ও সহযোগিতা করা হয়। ফলে তাদের কর্ম সন্তুষ্টি বাড়ে।

২। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে মা-বাবার প্রচেষ্টা যে গুরুত্বপূর্ণ তা শিক্ষকরা বুঝতে পারেন। ফলে মা-বাবার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বাড়ে।

৩। শিশুর আচরণ, ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষণের প্রতিবন্ধকতা দূর করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

৪। মাতা-পিতার কাছ থেকেও শিক্ষকরা শিক্ষণ ও শিক্ষা দানের ব্যাপারে সাহায্য পেতে পারেন। তারা বলতে পারেন, আমার শিশুকে এ পদ্ধতিতে শিখালে তারা ভাল করবে।

৫। শিক্ষকরা বিশ্বাস করে থাকেন যে, সকল ধরণের মাতা-পিতা তারা গরীব হোক, সিঙ্গেল হোক বা অশিক্ষিত হোক না কেন তবুও তারা শিশুর শিক্ষায় সাহায্য করতে পারে।

বিশ্বব্যাপী মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘের অবস্থা:

বর্তমানে অধিকাংশ উন্নত দেশের বিদ্যালয়গুলোতে মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ রয়েছে। কিছু কিছু দেশে মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘের ব্যাপারে রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কারণ সেসব দেশ বুঝতে পেরেছে যে, শিশুর শিক্ষা মাতা- পিতা ও শিক্ষক সংঘ ছাড়া কার্যকর হয় না। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ বা এর সমমানের সংস্থা রয়েছে।

যুক্তরাজ্যে ২০০৭ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের ৮৩ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ৬০ ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ বা এর সমমানের সংস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশে মাতা পিতা ও শিক্ষক সংঘের অবস্থা

বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ নেই বললেই চলে। তবে কিছু কিছু বিদ্যালয়ে নিয়মিত ভাবে প্যারেন্ট মিটিং এর আয়োজন করা হয়,বিশেষ করে বেসরকারী বিদ্যালয় গুলোতে। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয় গুলোতে তা করা হয় না। তবে বর্তমানে মাতা-পিতার সাথে শিক্ষকদের যোগাযোগ বাড়ছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সরকারী বিদ্যালয়ের তুলনায় বেসরকারী বিদ্যালয়ে মাতা-পিতা ও শিক্ষকের মধ্যে যোগাযোগ বেশি ভাল। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় তা খুব নগন্য। আবার গ্রামের তুলনায় শহরের বিদ্যালয় গুলোতে মাতা-পিতা ও শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক ভাল। আমাদের দেশে দেখা যায়, অধিকাংশ মাতা-পিতা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েই মনে করেন তাদের দায়িত্ব শেষ, বাকি কাজ গুলো করা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব। একারণে অধিকাংশ বিদ্যালয় গুলোতে কোন মাতা-পিতা সংঘ নেই বা থাকলেও তা খুবই দুর্বল। মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ না থাকার কারণে মাতা-পিতা শিশুর সক্ষমতা, শক্তিশালী ও দুর্বল দিক, শিশুর সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে পারেন না। ফলে দেখা যায়, শিশুর সক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে কখনো কখনো মাতা-পিতা শিশুর কাছ থেকে উচ্চ, আবার কখনো কখনো অসম্ভব ফল আশা করেন। যখন শিশুরা তাদের মাতা-পিতার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না, তখন তারা বিভিন্ন ধরণের হতাশা,উদ্বিগ্ন বা অন্যান্য মানসিক সমস্যার মধ্যে দিন অতিবাহিত করে। এ কারণে এস,এস,সি বা এইচ,এস,সি পরীক্ষার পর দেখা যায় যে, অনেকে এ-প্লাস না পেয়ে অথবা মাতা-পিতার প্রত্যাশিত রেজাল্ট করতে না পারায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। যা আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা খুললেই দেখতে পাই।

অনেক সময় অতিরিক্ত পড়াশোনার চাপের ফলে শিশুদের মধ্যে আগ্রাসী মনোভাব গড়ে উঠে, বিভিন্ন ধরনের অপরাধ মূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে ও অপ্রত্যাশিত আচরণ প্রদর্শন করে, স্কুল পলায়ন করে, স্কুলে আসতে চায়না, পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, নেশার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় দেখা যায়, আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ও নিরাপত্তার অভাবে অনেক শিক্ষার্থী তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারেনা। আবার বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষণজনিত সমস্যার সম্মুখীন হয়, বিশেষ করে গণিত ও ইংরেজী বিষয়ে ভাল ফল করতে পারেনা। ফলে তাদের পড়াশুনা বেশি দূর এগিয়ে নিতে পারে না। যদি বাংলাদেশের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শক্তি শালী মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ থাকত, তাহলে এ সব সমস্যা সহজেই দূর করা যেত। তবে আশার বাণী হল, বাংলাদেশে যদিও খুব কম সংখ্যক স্পেশাল স্কুল রয়েছে, তবে সেখানে শক্তিশালী মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ বিদ্যমান। এর ফলে শিশুর উন্নতি দ্রুত হচ্ছে।

বাংলাদেশে শক্তিশালী মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ না থাকার কারণ

সচেতনতার অভাব: যেহেতু বাংলাদেশের অধিকাংশ মাতা-পিতা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করেন এবং প্রত্যাশা করেন বাকি কাজ গুলো করা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব। একারণে মাতা-পিতা শিশুদের শিক্ষায় জড়িয়ে পড়েন না। এছাড়া মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘের গুরুত্ব সম্পর্কে অধিকাংশ মাতা-পিতা অবগত নন।

সময়: অনেক সময় শিক্ষক ও মাতা-পিতা তাদের সাক্ষাতের সময় মেলাতে পারেন না।

কিভাবে মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ গড়ে তুলতে পারি

মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্কুল মনোবিজ্ঞানী মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে পারেন। তারা স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকমণ্ডলী ও পিতা মাতাকে মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করতে পারেন এবং কিভাবে এ সংগঠনটি গড়ে তোলা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন। যেভাবে মাতা-পিতা ও শিক্ষকসংঘ গড়ে তুলতে পারি-

১। যখন মাতা-পিতাকে বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানানো হবে তখন তাদেরকে আন্তরিকভাবে স্বাগতম জানানো। এতে পিতা-মাতাদের স্কুল ও শিক্ষক এর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরী হবে।

২। মাতা-পিতাকে এই সংঘের গুরুত্ব ও গবেষণার ফল সম্পর্কে অবগত করা। এর মাধ্যমে তারা এ সংঘের প্রয়োজনীয়তা ও সুফল সম্পর্কে অবগত হবেন।

৩। মাতা-পিতারা সব সময় শিশুর ইতিবাচক দিকগুলো শুনতে পছন্দ করেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক ফোনের মাধ্যমে শিশুর ইতিবাচক দিকগুলো মাতা-পিতাকে জানাতে পারেন। এতে মাতা-পিতা ও শিক্ষকের মধ্যে যোগাযোগ ভাল হবে। কিন্তু আমাদের দেশে মাতা-পিতাকে স্কুল থেকে ফোন করা হলে মাতা-পিতা মনে করেন, শিশু স্কুলে কোন বাজে আচরণ বা খারাপ ফল করেছে। এ ধারণা দূর করতে হবে।

৪। যখন বিদ্যালয়ে মাতা-পিতাকে ডাকা হবে, তখন তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও গুরুত্ব দেয়া। এর ফলে মাতা-পিতা নিজেদেরকে স্কুল সেটিংএ গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে ও শিশুর খোঁজ খবর রাখবেন।

৫। প্যারেন্ট মিটিং এর জন্য এমন সময় ঠিক করতে হবে যাতে মাতা-পিতা ও শিক্ষক উভয়ই উপস্থিত থাকতে পারে এবং তাদের মতামত শেয়ার করতে পারে।

৬। বর্তমানে অনেক মাতা-পিতা ফেসবুক এবং অন্যান্য সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক একটি ব্যক্তিগত গ্রুপ খুলতে পারেন এবং সেখানে তিনি ম্যাসেজ ও reminder দিতে পারেন। এর মাধ্যমে মাতা-পিতা শিশু সম্পর্কে অবগত থাকবেন এবং মাতা-পিতা ও শিক্ষক এর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে।

৭। যখন মাতা-পিতা বিদ্যালয়ের কোন ইভেন্টে উপস্থিত থাকবেন বা স্বেচ্ছাসেবা মূলক কাজে জড়িত থাকবেন, তখন অবশ্যই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতরাং, সরকার, কর্তৃপক্ষ এবং মাতা-পিতাকে অবশ্যই প্রতিটি বিদ্যালয়ে মাতা-পিতা ও শিক্ষক সংঘ স্থাপনের জন্য আগ্রহী হতে হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে সমান সুবিধা পেতে পারে।

গেম আসক্তি

আদনিন জেবিন ইমি
মাস্টার্স (স্কুল সাইকোলজি, ৪র্থ ব্যাচ)
মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৫ বছরের কিশোরী মাহিরা। মা বাবার এক মাত্র মেয়ে। অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি পাওয়ার পর বাবা তাকে উপহার হিসেবে স্মার্টফোন কিনে দেন। নতুন ফোন পেয়ে মাহিরা ভীষণ খুশিতে রাত দিন মুঠোফোনেই বুদ হয়ে থাকে। চাকুরীজীবী মা বাবাও অতটা খেয়াল করেননি মাহিরার দিন কেমন কাটছে। খেয়াল করলেন যখন দেখলেন মাহিরা অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় ৫ বিষয়ে ফেল করেছে। পরীক্ষার ফল হাতে পেয়ে মাহিরার মা বাবার যেন টনক নড়ে। তখনি মা বাবা হঠাৎ করেই যেন আবিষ্কার করলেন মাহিরা আর আগের মত হাসিখুশি সেই মেয়েটি নেই। মা বাবার সাথে তার দূরত্ব তৈরী হয়েছে, সে এখন আর কোথাও যেতে চায়না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল সে ইদানীং স্কুলেও প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোও সে এড়িয়ে চলছে এখন। অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরে মা তার ফোনটি নিয়ে নিতে চাইলে দেখা যায় তার ভিন্ন এক রূপ। চেঁচামেচি করে দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে বসে থাকে সে। এমন অবস্থায় তাকে মনোবিজ্ঞানীর কাছে নেয়া হলে তিনি বললেন, মাহিরার বৈশিষ্ট্যের এর সাথে গেম আসক্তিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে। গেম আসক্তি শুধু বাংলাদেশেই নয় সারা বিশ্বেই এটা ছড়িয়ে পড়ছে। মনোবিজ্ঞানী আরো জানান যে, এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের "গেমিং ডিজঅর্ডার" রোগে আক্রান্ত হিসেবে ধরা হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনলাইন গেম, কম্পিউটার বা ভিডিও গেমের ক্ষতিকারক ব্যবহারকে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

গেম আসক্তি কি?

গেম আসক্তি এবং ইন্টারনেট আসক্তি কিছুটা ভিন্ন জিনিস। যখন একজন মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠেই গেম খেলার আকুতি অনুভব করবে, দিনের বেশির ভাগ সময় এমন কি দৈনন্দিন জীবনের গুরূত্বপূর্ণ কাজ বাদ দিয়ে দিনের বেশির ভাগ সময় যখন গেম খেলবে কিংবা সারা রাত গেম খেলার জন্য জেগে থাকে তখন তা গেম আসক্তি বলা যায় কিন্তু কেউ একজন গেম খেললেই সেটা গেম আসক্তি নয়। তাই গেম খেললে সেটাকে নেতিবাচকভাবে দেখার কোন কারন নেই।

গবেষণায় দেখা গেছে গেম আসক্তির সাথে সাথে মানসিক রোগেও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা বোধ ইত্যাদি সমস্যাতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

গেম আসক্তির লক্ষণ

১। দিনের শুরুতেই গেম খেলার প্রতি আকুতি অনুভব করবে। বেশির ভাগ সময় নিজের মুঠোফোন / গেমিং ডিভাইস নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।

২। আগের থেকে বেশি সময় গেম খেলে ব্যয় করবে, কিছু ক্ষেত্রে দিনের প্রায় বেশির ভাগ সময়।

৩। গেম খেলা ব্যতীত অন্য কিছুতেই আনন্দ পাবে না, গেম খেলায় ব্যাঘাত ঘটলে রাগারাগি করবে কিংবা অস্বাভাবিক আচরণ করবে।

৪। গেম খেলার কারণে প্রতিদিনের অন্য সবকাজ ব্যাহত হবে, কাজের মান কমে যাবে। পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হতে থাকবে। ঘুমের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৫। খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়াতেও অস্বাভাবিকতা চলে আসবে, গেম খেলার জন্য দ্রুত খাওয়ার চেষ্টা করবে বা এমন সব খাবার নির্বাচন করবে যে গুলো দ্রুত খাওয়া যায়।

৬। মিথ্যা বলার অভ্যাস তৈরি হবে, দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্তনগুলো আড়াল করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিবে।

৭। পরিবারের মানুষদের সাথে দূরত্ব তৈরী হবে, আত্মীয় পরিজন এড়িয়ে চলতে চাইবে। সামাজিকতা কমে যাবে।

প্রতিরোধের উপায়

১৮ বছরের কম বয়সীদের হাতে মুঠো ফোন তুলে দেয়া যাবে না। দিলেও তা মা বাবা অথবা অভিভাবকদের সামনে বসে ব্যবহার করতে হবে। ব্যক্তি নিজেকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তার উপর নির্ভর করে তার হাতে ব্যক্তিগত মুঠোফোন/ কম্পিউটার/ গেমিং ডিভাইস দিতে হবে। মোটকথা গ্যাজেট ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের মাঝে রাখতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের অধিক গেম খেলতে দেয়া / ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না কোন ভাবেই। অভিভাবকেরা নিজেদের মুঠোফোন/ গ্যাজেটে নিরাপত্তামূলক সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারেন যাতে সন্তান কোন ভাবেই অনিরাপদ কোন ওয়েব সাইটে প্রবেশ করতে না পারে বা তার জন্য অনুপযুক্ত কোন গেম খেলতে না পারে। সন্তানের হাতে ডিভাইস তুলে দিয়ে অভিভাবকগণ এই ভেবে আনন্দিত হবেন না যে আপনার সন্তান এতে প্রযুক্তিতে দক্ষ হয়ে উঠতে পারবে। কেন না এতে উপকারের থেকে অপকারের আশঙ্কা বেশি। সর্বোপরি সন্তানকে গুণগত সময় দিতে হবে। অনেক সময় মা-বাবার নিজেরও প্রযুক্তির প্রতি আসক্তি থাকে, আর মা-বাবা নিজেরা প্রযুক্তিতে মেতে থাকার জন্য সন্তানের হাতে গ্যাজেট ধরিয়ে দেন তাকে ব্যস্ত রাখার জন্য। সেই ক্ষেত্রে মা বাবাকে আগে নিজেকে শুধরাতে হবে। সন্তান যখন প্রযুক্তি ব্যবহারের উপযুক্ত হবে তখনই তার হাতে গ্যাজেট দিন তার আগে নয়।

তবে গেম আসক্তি যদি হয়েই যায় তবে মনোবিজ্ঞানীর শরণাপন্ন হতে হবে। মনে রাখতে হবে শারীরিক সমস্যারমত মানসিক সমস্যাগুলোর চিকিৎসা প্রয়োজন, মানসিক সমস্যা কোন লুকিয়ে রাখার বিষয় নয়।

ভাষা নিয়ে ভাবনা

খাদিজা আহসান
স্নাতক ৩য় বর্ষ, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার মাতৃভাষা। আলো-বাতাসের মত সর্বক্ষণ ভোগ করতে করতে এর অস্তিত্ব নিয়ে পৃথক ভাবে ভাবনার চিন্তা আসে না অথবা চিন্তা করতে চাওয়া হয়না। ভাষার শৃঙ্খলে গাঁথা পড়েই রচিত হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যকর্ম, মহাকাব্য কিংবা সুচারু বাণীসম্ভার। ভাষার মাধ্যমেই পরিচিত হয়েছে যুগ-যুগান্তের সাহিত্যিকদের সৃজনশীলতা, বিদ্বানদের পাণ্ডিত্য। জন্ম হতে প্রজন্মের ধারায় জীবনের অস্তিত্বের ধারক ও বাহক–এই ভাষা।

ভাষা সৃষ্টিশীল; এর বিনির্মাণ কৌশলও জটিল ও প্রবাহমান। তবে ভাষার জৈবিক ক্রিয়াকলাপও কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। ভাষাকে সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে ভাবতে মানব দেহ, মন ও চিন্তায় ভাষার জন্মলাভ ও বিকশিত হওয়ার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অজানাই রয়ে যায়। এবারে ভাষার জটিল ব্যাকরণিক ও সাহিত্যিক সংলাপের সম্ভার থেকে বেরিয়ে বিকাশ মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শিশুর ভাষার সূচনা ও বিকাশের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার আলোচনায় আসা যাক।

ভাষা মূলত শিশুর জন্মের পর থেকে বিভিন্ন বয়সে ধাপে ধাপে বিকাশ লাভ করতে থাকে এবং এরপর উচ্চতর ভাষাজ্ঞান লাভের ধারা বস্তুত সারা জীবন ধরেই চলমান থাকে। জন্ম মুহূর্ত হতে কান্নার মাধ্যমে শিশুর ভাষার প্রাথমিক বিকাশের সূচনা হয়। জীবনের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ, নবজাতক পর্যায়ে ক্রন্দনই শিশুর ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন। এই কান্নার মাধ্যমে ভাব প্রকাশ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে প্রায় ২-৩ মাস পর্যন্ত। এই পর্যায়কে বলা হয় Earliest Vocalization। এই কান্নার মাধ্যমেই শিশু প্রকাশ করে থাকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অস্বস্তি, ভয়, ব্যথা এবং অন্যান্য চাহিদা। কান্নার স্বরের ও তীব্রতার তারতম্য ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি প্রকাশ করে। Ostwald এবং Pelzman এর মতে, "Crying is one of the social acts of infant at first of life"।

ভাষার বিকাশে এর পরের ধাপকে বলা হয় Random Vocalization বা Babbling। জন্মের পরবর্তী ৪-৬ মাস পর্যন্ত বা এক বছরের কম সময় পর্যন্ত এ পর্যায় স্থায়ী হয়। এ বৈশিষ্ট্য জৈবিক বিধায় সকল শিশুর ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় কারণ প্রকৃত কথোপকথনের সূচনা এর মাধ্যমেই হয়। এ সময় শিশুরা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য শব্দ করে থাকে যার কোনো অর্থ থাকে না, একে Cooing বলা হয়। এর কিছুদিন পর শিশু শব্দের ভাঙ্গা ভাঙ্গা অংশ অর্থাৎ শব্দাংশ উচ্চারণ করতে থাকে এবং পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, যেমন বা-বা, মা-মা, দা-দা, তা-তা ইত্যাদি। একে বলা হয় Lalling। ৮ মাসের সময় এর তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং ১ বছরে সম্পূর্ণ লোপ পায়। শিশুরা এ ধরণের আধো আধো উচ্চারণে আনন্দ লাভ করে বিশেষ করে বড়রা যদি তাতে উৎসাহ প্রদান করে। ১ বছর বয়সে সে নিজের কণ্ঠস্বর শুনে আত্মতৃপ্তি পায় এবং সেটি তার কথা বলার এরূপ চেষ্টায় উদ্দীপনা যোগায়। ফলে শিশু ক্রমাগত এ আত্মতৃপ্তির প্রতিবর্তী ক্রিয়া হিসেবে শব্দ উচ্চারণের প্রক্রিয়া এমনকি কান্নাও অব্যাহত রাখে। এ পর্যায়কে বলা হয় Circular Reflex।

১ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা সংখ্যা, রঙ বা ছোট ছোট বস্তুর নামের সাথে পরিচিত হয় এবং একক শব্দ উচ্চারণ করতে শেখে। ১ বছর বয়সের শেষ দিকে শিশুরা অন্যদের কথা অনুকরণ করে কথা বলার চেষ্টা করে। এ পর্যায়ে শিশুর ভাষার বিকাশে পরিবেশের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ সময় শিশুরা ভাষার বিকল্প হিসেবে ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমেও ভাব প্রকাশের চেষ্টা করে। এই ধাপকে বলা হয় Imitative Stage। ২ বছর বয়সে শিশু শব্দ ও বাক্য বুঝতে শেখে এবং অন্যদের কথায় তার প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়। তখন তারা ২/৩ টি শব্দ জোড়া দিয়ে অসম্পূর্ণ বা সম্পূর্ণ কথা বলে। এ পর্যায়ে শিশুরা Real Speech বা Verbal Comprehension Stage এ প্রবেশ করে। তখন শিশু পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী কথা বলা শেখে। এভাবে ক্রমাগত সে নতুন নতুন শব্দ শিখতে থাকে। আর ভাষা শেখার সাথে সাথে শিশুরা আবেগ প্রকাশের উপায়ও শিখতে থাকে। দেড় বছর বয়সে শিশুর শব্দ ভাণ্ডার ১০০ এর কম থাকে। এরপর শব্দ ভাণ্ডার

দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। দুই, তিন, চার ও পাঁচ বছর বয়সে শব্দ ভাণ্ডার যথাক্রমে ৩০০, ৯০০, ১৬০০ এবং ২২০০ তে উন্নীত হয়। এক বছরের শিশু প্রত্যক্ষ বস্তু নিয়ে কথা বলে, কিন্তু ২ বছরের সময় সে অনুপস্থিত ব্যক্তি বা বস্তু নিয়েও কথা বলতে পারে। আড়াই বছরে শিশু কেবল বিচ্ছিন্ন শব্দ উচ্চারণ করে।

৩ বছরের সময় শিশু ছোট ছোট বাক্য বলতে শেখে এবং কয়েকদিন পূর্বের ঘটনাও কিছুটা উল্লেখ করতে পারে। ৩ বছরের পূর্বে শিশু বাক্য গঠন করতে পারে না, কারণ তখনও সে ক্রিয়া আর অব্যয় পদের ব্যবহার করতে শেখে না। আর ৫ বছরের পূর্বে শিশুর বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে ধারণা জন্মে না। এই বস্তু বা বিষয়ের ধারণা সৃষ্টির পর্যায়টিই শিশুর ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের চূড়ান্ত অবস্থা, যাকে বলা হয় Concept Formation Stage। তিন থেকে পাঁচ বছরের সময় শিশুরা জটিল প্রশ্নও করতে শেখে। শিশুরা পরিবেশের স্থির বস্তু অপেক্ষা গতিশীল বস্তুর প্রতি অধিক সংবেদনশীল হয়ে থাকে।

মনোবিজ্ঞানী Jean Piaget শিশুর কথা বলার বিষয় বস্তুকে বয়স অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করেন। সাত-আট বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর কথাবার্তা আত্মকেন্দ্রিক থাকে। এ সময় শিশু নিজে নিজে কথা বলে বিশেষ করে খেলার সময়, যাকে সমান্তরাল খেলা বা Parallel Play বলা হয়। এ সময়ের একটি বৈশিষ্ট্য হল, শিশু কথাবার্তা বলে সবই তার নিজের সম্পর্কে বা তার নিজের জগতকে কেন্দ্র করে। আর এ সময় তারা কার্যকারণ সম্পর্ক বোঝে না, তাই 'কেন' এর উত্তর দিতে পারেনা। ৮ বছর বয়সের পর শিশুর কথাবার্তা ক্রমশ সামাজিক হয়। সে নিজের কথা বলার পাশাপাশি অন্যদের সম্পর্কেও বলে। সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সে অন্যের কথা বোঝার চেষ্টা করে এবং চিন্তার জগতে প্রবেশ করে। Jean Piaget এর মতে, প্রথম পর্যায়ে শিশু সামাজিক পরিবেশে থাকলেও ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা বজায় রাখে আর দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশু ব্যক্তিগত কাজে নিয়োজিত থাকলেও সামাজিকতা রক্ষা করে চলে। উক্ত দুই পর্যায়কে যথাক্রমে Ego-Centric Stage & Socialized Stage বলা হয়।

মনোবিজ্ঞানী Roger William Brown ভাষার তিনটি মানদণ্ডের কথা বলেছেন। যথা–

- অর্থপূর্ণতা (Semanticity)–ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর নির্দিষ্ট অর্থ থাকতে হবে।
- সৃজনশীলতা (Generativity)–ভাষা সৃষ্টিশীল বিধায় একই ভাব একাধিক উপায়ে, বিভিন্ন বাক্য বা ভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।
- স্থানচ্যুতি (Displacement)–ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যে একই সাথে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের তথ্য সন্নিবেশিত থাকে, বর্তমান সময়ে কথা বললেও তাতে পূর্বের বা পরের সময়ের কথাও বলা হয়।

শিশুর ভাষা এবং বোধ ক্ষমতার বিকাশের ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যেমনঃ অন্যের কথা বুঝতে হবে, অন্যের বোধগম্য উপায়ে ভাব প্রকাশ করতে হবে, কথা বলার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি উপাদান থাকতে হবে। যথা–

- শব্দের সঠিক উচ্চারণ
- শব্দ চয়নে পারদর্শিতা
- শব্দ সহযোগে বাক্য তৈরির ক্ষমতা

শিশুর কথা বলার পরিমাণ কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন–কথা বলার দৈহিক ও মানসিক সক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা, নিয়মানুবর্তিতা, জন্মক্রম, পরিবারের সদস্য সংখ্যা ও আর্থসামাজিক অবস্থা, অনুকরণের সুযোগ, শিশুর লালন-পালন প্রক্রিয়া, বাবা-মায়ের শিক্ষার পরিমাণ ও কথা বলার ধরণ, মা ও শিশুর পারস্পরিক সম্পর্ক, ভাষা শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষাদানের স্বরূপ ইত্যাদি। এ বিষয়গুলোর অভাব থাকলে শিশুর কথা বলা বা ভাষা শেখা বিলম্বিত হয়, শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয় না যাকে Delayed Speech বলা হয়। এটা ভাষার পরিমাণগত সমস্যা। আবার গুণগত সমস্যা বা Defective Speech এর সমস্যা হতে পারে শব্দের উচ্চারণ, অর্থ ও বাক্য গঠন বা পদক্রম বিন্যাসের ত্রুটির কারণে।

ভাষা সংক্রান্ত কার্যাবলী মস্তিষ্কের বামপার্শ্ব বা Left Hemisphere দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মস্তিষ্কের Temporal Lobe এবং Parietal Lobe ভাষার দক্ষতা নিয়ন্ত্রণ করে। মস্তিষ্কের এ অংশে আঘাত, ক্ষতি বা রোগ জনিত কারণে সৃষ্ট ভাষাগত সমস্যা বা বাচনিক অস্বাভাবিকতাকে বলা হয় Speech Disorder, যার মধ্যে Aphasia অন্যতম। এটি হল কথা বলার অক্ষমতা যেখানে ব্যক্তি অর্থপূর্ণ কথা বুঝতে পারে না, বলতে পারে না এবং কথা শুনে পুনরাবৃত্তি করতে

পারে না। Temporal Lobe এর Broca's Speech Area অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিন ধরণের বাচনিক ত্রুটি দেখা দিতে পারে–

- Agrammatism ভাষায় ব্যাকরণিক ভুল এবং অন্বয়যুক্ত শব্দ ব্যবহারে অপারগতা
- Anomia কোন কিছুর নাম মনে করতে পারার ব্যর্থতা বা শব্দ চয়নে বিলম্ব
- Articulation difficulty বানান ভুল করা বা ভুল উচ্চারণ করা

এ ছাড়াও, এ সমস্যায় আক্রান্তরা ধারাবাহিক নির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হয়।

Temporal Lobe এর Wernicke's Speech Area অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে কথা বলার সময় বাক্যে ব্যাকরণগত ভুল হয় না, তবে আক্রান্ত ব্যক্তি–

- অর্থবিহীন শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করে
- উচ্চারিত শব্দ বা শব্দের অর্থ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়
- বিষয়ভিত্তিক শব্দ কম ব্যবহার করে
- চিন্তাকে ভাষায় রূপ দেয়ার ক্ষমতা হারায়

ভাষা শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতার মধ্যে Dyslexia অন্যতম। এটি শব্দ বা বাক্য বুঝতে পারা, সঠিক বানান করা এবং শব্দের অর্থ বুঝতে পারার ব্যর্থতাজনিত সমস্যা যা সাধারণত স্কুলগামী শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। ভাষা ঠিকমত পড়তে ও লিখতে না পারা বা কষ্টসাধ্য মনে হওয়া এ সমস্যার প্রধান লক্ষণ। মস্তিষ্কের ধ্বনি প্রক্রিয়াকরণের সীমাবদ্ধতা, আঘাত বা বিকাশ জনিত ত্রুটি Dyslexia এর কারণ বলে মনে করা হয়। Dyslexia বিভিন্ন রকম হতে পারে–

- Visual dyslexia তে লেখা দেখে পড়তে বা বুঝতে অসুবিধা হয়
- Auditory dyslexia তে কথা শুনে বুঝতে অসুবিধা হয়
- Dysgraphia তে পেন্সিল বা কলম ধরে লেখার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়

সহজ কথা Dyslexia হচ্ছে পড়া, লেখা, শোনা, বানান করা, তথ্য মনে করা, নতুন শব্দ শেখা ইত্যাদির সীমাবদ্ধতা, একই জাতীয় শব্দ বুঝতে, পড়ার সময় লাইনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার অপারগতা, লেখার ক্ষেত্রে ডান-বাম হাত এর ভূমিকা নির্ধারণ করতে না পারা, শোনা কথা মনে করতে না পারা, খেলার প্রক্রিয়া বা স্থানিক সম্পর্ক অনুধাবন করতে না পারা ইত্যাদি।

উপসংহারের আগে আবারো ভাষার পর্যায়ক্রমিক ও ধারাবাহিক বিকাশের সূত্রে ফিরে আসা যাক।

জীবনের বিভিন্ন ধাপে ধাপে এভাবেই বিকশিত হয় মানুষের ভাষার দক্ষতা, সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা; নির্ণীত হয় তার একচ্ছত্র শ্রেষ্ঠত্ব সমগ্র প্রাণীকুলের উপর এই ভাষারই বদৌলতে। তারপর একটুখানি প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যার সাথে পরিচয় হতেই সেই জীবনের সোপানে সোপানে অর্জিত সাধনালব্ধ মাতৃভাষার সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য ভুলে একই ভাষার মধ্যে বিবিধ বিদেশি ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে সংকর ভাষা তৈরি করে ফেলি।

একটি বাংলা বাক্যের মধ্যে ১০-১২ টি বিদেশি শব্দের ব্যবহার না করলে যেন সভ্যতার অগ্রযাত্রায় তাল মেলানো যায়না, নিজের অতি সামান্য অর্জিত বিদ্যার দৌড় জাহির করা হয় না, নিজেকে যথেষ্ট শিক্ষিত মনে হয় না। কিন্তু ভুলে যাই, মাতৃভাষার বিকল্প নেই। এর মত স্পন্দন জাগে না, স্বতঃস্ফূর্ততা আসেনা অন্য কোনও ভাষাতে। ভুলে যাই, বোধের জানালা উন্মুক্ত হয়না এ ভাষার নির্যাস ব্যতীত, হৃদয়ের ঊষর ভূমিকে তৃপ্ত করা যায় শুধুই এ ভাষার সিঞ্চিত জলে। মাতৃভাষার এ ঋণ কখনই শোধ করা যায় না।

বৈষয়িক জীবনের নানা ক্ষেত্রে অনৈচ্ছিক ভাবে হয়তো মাতৃভাষার সমাদর করা হয়ে ওঠে না; ব্যবহারিক জীবনের বিচিত্র সীমাবদ্ধতায় হয়তো তার জয়গান গাওয়া হয়না। কিন্তু এতটুকু চেতনা তো ধারণ করা যায় যে, মাতৃভাষার বিশুদ্ধ চর্চা ও বিকাশের মধ্যে দিয়ে জগতকে না হোক, অন্তত নিজের অন্তরকে পরিতৃপ্ত করা যায়!

School Psychologists and Mental Health of Children and Youth

Saima Wazed Hossain

Licensed School Psychologist
Advisor to the DG, WHO on Mental Health and Autism
Chairperson, National Advisory Committee on Autism and NDDs, Bangladesh
Chairperson, Shuchona Foundation

The concept of school psychologists is not well known in Bangladesh. Although in recent years, we have been able to bring the issue of mental health to the fore, making provisions for having psychologists in school is still uncharted territory for us. Given the work they do and the impact their work has on the mental well-being of children and youth, it is of the utmost importance that we start educating ourselves, the policymakers, and stakeholders about this professional area.

Although the profession has not yet been mainstreamed in our part of the world, currently around 100,000 school psychologists are working in more than 48 countries of the world including USA, Spain, Canada, Japan, Turkey etc. As a licensed school psychologist myself, my aim in writing this article is to introduce the profession, and its practitioners, to the readers and explain briefly who they are, what they do, and why it is important that we develop this field as specialized professional area in Bangladesh.

Importance of Field

School psychology is an offshoot of functional psychology that is concerned with the science and practice of psychology with children, youth, families, learners of all ages and the educational process. School psychologists are professionals who can help children and youth achieve success academically, socially, behaviorally, and emotionally. They can also advocate for the rights of children and youth with disabilities as well as assist parents and caregivers become better informed and stronger advocates for their family members.

The work of school psychologists enable schools and other institutions to successfully: improve academic achievement; promote positive behavior and mental health; support diverse learners; create safe and positive school climates; strengthen family-school partnerships; and improve school-wide assessment and accountability.

There are a myriad of problems which can be faced by children and youth related to learning, social relationships, complex decisions, managing emotions etc. They can suffer from depression, anxiety, worry or isolation. School psychologists can come into play in such situations by understanding and resolving the short-term and long-term issues and problems faced by the children and youth. They are a key medium for understanding how such issues affect learning, behavior, wellbeing and educational engagement.

According to the American Psychological Association (APA), school psychologists provide a

range of psychological diagnosis, assessment, intervention, prevention, health promotion, program development and evaluation services with a special focus on the developmental processes of children and youth within the context of schools, families and other institutions. They intervene at the individual and system level, and develop, implement and evaluate preventive programs. They conduct ecologically valid assessments and promote positive learning environment for the healthy development of children and youth.

Ambit of Work

The primary responsibilities of school psychologists include:

1. Undertaking comprehensive assessments to diagnose intellectual ability, learning processes, academic skills and aptitude, social skills, emotional functioning, behavioral problems, and neurological processes
2. Consulting with parents, teachers, administrators, pediatricians, psychiatrists, neurologists and therapists
3. Developing behavioral intervention plans, individual education plans, prevention programs (for instance against violence, bullying, truancy and dropouts), alternatives to corporal punishments
4. Advocating for the rights of children and their families
5. Conducting training for parents, teachers, and other professionals and imparting training on social skills
6. Coordinating services existing in the community
7. Researching
8. Counseling

Apart from the primary responsibilities enumerated above, alternate roles of school psychologists can vary from society to society and may include, administration, curriculum development, advising with legislation and policy development, crisis intervention and victim assistance.

School psychologists can be typically seen working in public and private schools, universities, school-based health and mental health centers, community-based day-treatment or residential clinics and hospitals, juvenile justice centers and even in private practice. School psychologists work for, and together with, students, parents, teachers, pediatricians, neurologists, school administrators, community service providers, social workers and therapists.

Attributes and Qualifications

The attributes necessary for a school psychologist includes principally, knowledge on psychology and education, usually satisfied by relevant postgraduate studies. They should have understanding and respect for human diversity. They should be able to deliver a comprehensive range of direct, measurable services for children, families and educational institutions. Given the complexity of their responsibilities and the particular sensitivities associated with the mental health sector, appropriate training is also a prerequisite.

Although the specific areas of training for school psychologists will vary from country to country, as an example, we can look at the knowledge and skills required by such professionals in USA as

prescribed by the National Association of School Psychologists (NASP): data collection and analysis; assessment; progress monitoring; school wide practices to promote learning; resilience and risk factors; consultation and collaboration; interventions; instructional support; crisis preparedness, response and recovery; collaborating between families, schools and communities; diversity in development and learning; research and program evaluation; professional ethics, applicable laws and systems.

Conclusion

As the above discussion sets out, school psychologists can play a crucial role in supporting the ability of children and youth to learn and succeed academically, socially, behaviorally and emotionally. By partnering with families, teachers, educational institutions and other stakeholders, they help create safe, healthy and supportive learning environments. It therefore, goes without saying, that the introduction of school psychologists in the schools and educational institutions in Bangladesh would be a very positive move towards the healthy mental development of our children and youth.

Saima Wazed Hossain is a licensed school psychologist, Chairperson of National Advisory Committee on Autism and Neurodevelopmental Disorders, Bangladesh, and Member of the Expert Advisory Panel on Mental Health, World Health Organization.

Source: Originally published in bdnews24.com on September 3, 2015
Retrieved from https://opinion.bdnews24.com/author/saima-wazed-hossains

বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি সোসাইটির উপদেষ্টা পর্ষদ

ড. মোঃ রওশন আলী
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. আব্দুল খালেক
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নীহাররঞ্জন সরকার
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. আনিসুজ্জামান
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মেহতাব খানম
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং
সাইকোলজি বিভাগ
অনারারী অধ্যাপক
মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি সোসাইটির কার্যনির্বাহী পর্ষদ (জানুয়ারি ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২১)

ড. মোঃ কামাল উদ্দিন
অধ্যাপক
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রেসিডেন্ট

ড. মাহফুজা খানম
অধ্যাপক
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাইস প্রেসিডেন্ট

ফারজানা বেগম
সহকারী অধ্যাপক
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জেনারেল সেক্রেটারি

বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি সোসাইটির কার্যনির্বাহী পর্ষদ (জানুয়ারি ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২১)

ইশরাত শাহনাজ
সহকারী অধ্যাপক
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জয়েন্ট সেক্রেটারি

সুমাইয়া আলি রাইসা
লেকচারার
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফিন্যানসিয়াল সেক্রেটারি

তিথি আগাথা হালদার
বিহেভিয়ার থেরাপিস্ট
সাজেদা ফাউন্ডেশন
ঢাকা, বাংলাদেশ
অরগানাইজিং সেক্রেটারি

বীথি রানী
চাইল্ড সাইকোলজিস্ট
ঢাকা শিশু হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ
কমিউনিকেশন সেক্রেটারি

মোছাঃ জাকিয়া রহমান
পার্টটাইম লেকচারার
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ইডেন মহিলা কলেজ
পাবলিকেশন সেক্রেটারি

বিথী রানী দে
এমএস, স্কুল সাইকোলজি
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সেমিনার সেক্রেটারি

শিমুল মণ্ডল
চাইল্ড সাইকোলজিস্ট
রেইনবো ভ্যালি, গুলশান, ঢাকা
অফিস সেক্রেটারি

জামিউন নাহার
সহকারী অধ্যাপক
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মেম্বার

খাদিজা আক্তার
এমএস, স্কুল সাইকোলজি
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মেম্বার

রিজভী খাতুন
চাইল্ড সাইকোলজিস্ট
নারী ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র
আশুলিয়া, ঢাকা
মেম্বার

শামীমা আক্তার
এমএইচপিএসএস অফিসার
হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল
টেকনাফ, কক্সবাজার
মেম্বার

রুমা শীল
এমএস, স্কুল সাইকোলজি
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মেম্বার

বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি সোসাইটির জীবন সদস্য

[১]

ড. মোঃ কামাল উদ্দিন
অধ্যাপক
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[২]

ফারজানা বেগম
সহকারী অধ্যাপক
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়া

[৩]

সুমাইয়া আলি রাইসা
লেকচারার
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[৪]

মামুন শেখ
এমএস, স্কুল সাইকোলজি
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[৫]

বীথি রানী
চাইল্ড সাইকোলজিস্ট
ঢাকা শিশু হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ

[৬]

তিথি আগাথা হালদার
বিহেভিয়ার থেরাপিস্ট
সাজেদা ফাউন্ডেশন
ঢাকা, বাংলাদেশ

[৭]

বিপাশা সিংহ
সহকারী অধ্যাপক
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[৮]

ইশরাত শাহনাজ
সহকারী অধ্যাপক
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[৯]

জামিউন নাহার
সহকারী অধ্যাপক
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[১০]

ড মাহফুজা খানম
অধ্যাপক
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[১১]

রিজভী খাতুন
চাইল্ড সাইকোলজিস্ট
নারী ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র
আশুলিয়া, ঢাকা

[১২]

খাদিজা আক্তার
এমএস, স্কুল সাইকোলজি
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি সোসাইটির জীবন সদস্য

[১৩]

বিথী রানী দে
এমএস, স্কুল সাইকোলজি
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[১৪]

মোছাঃ জাকিয়া রহমান
পার্টটাইম লেকচারার
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ইডেন মহিলা কলেজ

[১৫]

শিমুল মণ্ডল
চাইল্ড সাইকোলজিস্ট
রেইনবো ভ্যালি, গুলশান, ঢাকা

[১৬]

রুমা শীল
এমএস, স্কুল সাইকোলজি
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[১৭]

শামীমা আক্তার
এমএইচপিএসএস অফিসার
হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল
টেকনাফ, কক্সবাজার

[১৮]

ইসরাত সোহানা
এমএস, স্কুল সাইকোলজি
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[১৯]

রিফাত সুলতানা
এমএস, স্কুল সাইকোলজি
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[২০]

নাহিদা সুলতানা
এমএস, স্কুল সাইকোলজি
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[২১]

নুপুর রহমান
এমএস, স্কুল সাইকোলজি
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[২২]

তাসনুভা তাজরিন মল্লিক
সাইকোলজিস্ট, ব্র্যাক
উখিয়া, কক্সবাজার

[২৩]

সাদিয়া ফেরদৌস
এমএস, স্কুল সাইকোলজি
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[২৪]

ফাবিহা আনবার দ্বীপি
চাইল্ড সাইকোলজিস্ট
ঢাকা শিশু হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ

বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি সোসাইটির জীবন সদস্য

[২৫]

সৈয়দ আবু সাঈদ
এমএস, স্কুল সাইকোলজি
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[২৬]

তাহমিনা সরকার প্রকৃতি
সাইকোলজিস্ট, ব্র্যাক
উখিয়া, কক্সবাজার

[২৭]

প্রীতিজা পারমিতা
কনসালট্যান্ট, ব্র্যাক
ঢাকা, বাংলাদেশ

[২৮]

জান্নাতুল ফেরদৌসী
বিহেভিয়ার থেরাপিস্ট
সাজেদা ফাউন্ডেশন
ঢাকা, বাংলাদেশ

সহযোগী সদস্য

[১]

অমিত কুমার ভৌমিক
সিনিয়র আর্কিটেক্ট
ঢাকা, বাংলাদেশ

[২]

জান্নাতুল ফেরদৌস
লেকচারার
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

এক নজরে স্কুল সাইকোলজির পরিসংখ্যান

স্কুল সাইকোলজি ব্যাচ - ১ (২০১৫-১৬)			
প্রতিষ্ঠান	ছেলে	মেয়ে	মোট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৯	১৫	২৪
ইডেন মহিলা কলেজ	-	৫	৫
ঢাকা কলেজ	১	-	১
সর্বমোট	১০	২০	৩০

স্কুল সাইকোলজি ব্যাচ - ২ (২০১৬-১৭)			
প্রতিষ্ঠান	ছেলে	মেয়ে	মোট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১	১২	১৩
ইডেন মহিলা কলেজ	-	৯	৯
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	১	৪	৫
সর্বমোট	২	২৫	২৭

স্কুল সাইকোলজি ব্যাচ - ৩ (২০১৭-১৮)			
প্রতিষ্ঠান	ছেলে	মেয়ে	মোট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৮	১১	১৯
ইডেন মহিলা কলেজ	-	৯	৯
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	২	১	৩
লালমাটিয়া কলেজ	-	১	১
সর্বমোট	১০	২২	৩২

স্কুল সাইকোলজি ব্যাচ - ৪ (২০১৮-১৯)			
প্রতিষ্ঠান	ছেলে	মেয়ে	মোট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৮	২১	২৯
ইডেন মহিলা কলেজ	-	৯	৯
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	২	০	২
চট্টগ্রাম কলেজ	০	১	১
ঢাকা কলেজ	১	-	১
শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজ	১	১	২
সর্বমোট	১২	৩২	৪৪

শৈশব ক্রমবিকাশ চার্ট

CHILD FOUNDATION

Countrywide Health Initiative for Learning and Development

Inspiring Everyday Superheroes

Corporate Office:
Taher Tower, Plot # 10 (5th Floor)
Gulshan North Circle, Gulshan-2
Dhaka 1212, Bangladesh
Phone: + 88 02 9851895, 9852730
Fax: + 88 02 9852714
Web: www.childfoundationbd.com
Email: info@childfoundationbd.com

	০-৩ মাস	৩-৬ মাস	৬-৯ মাস	৯-১২ মাস	১২-১৮ মাস	১৮-২৪ মাস
জ্ঞান সম্বন্ধনীয়	. চোখের সামনে কোন বস্তু আস্তে আস্তে নাড়ালে তা তাকিয়ে দেখা । . মুখের কাছে হাত আনা । . কোন বস্তু আগে পিছে করলে তার দিকে দৃষ্টি রাখা । . নিজের হাত পর্যবেক্ষণ করা । . মুখে খেলনা নেওয়া ।	. যে কোন কারনে হাত পা অনবরত নাড়া চাড়া করা । . কোন বস্তুকে খোঁজার জন্য বিভিন্ন প্রছা অবলম্বন করা । . মুখ হতে কাপড় সরিয়ে দেওয়া । . ইচ্ছা করে কোন বস্তু ফেলে দেওয়া ও পরে যাওয়া দেখা । . ঝুমঝুমি হাতে নিয়ে খেলা করা ।	. কিছু পরিচিত কাজ অনুকরণ করা (যেমন: হাত তালি দেওয়া) . লুকানো বস্তু খুজে বের করা । . এক হাত দিয়ে কোন বস্তু নিয়ে অন্য হাত দিয়ে ধরা । . খেলনা পাবার জন্য নড়াচড়া করা । . কাঙ্খিত বস্তু পাবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ।	. বইয়ে ছবি দেখে তাকানো । . খেলনার চাকা ঘুরানো । . এক হাত দিয়ে কোন বস্তু নিয়ে অন্য হাত দিয়ে ধরা । . কোন নতুন আর্কষনীয় খেলা বা কর্মকান্ড করেন এমন কারো সান্নিধ্যে থাকা । . আস্টা যুক্ত খেলনার আংটা খুলে ফেলা . কোন বস্তু না দেখেও তার উপস্থিতি বুঝতে পারা ।	. বড়দের সাথে বইয়ের ছবি দেখা । . ছোট কোন বস্তু ছোট কোন বাক্সে রাখতে পারে . প্রতিদিনের ব্যবহার্য জিনিস প্রর্দশণ করা । . খেলার সময় কাছাকাছি জিনিসের সমণয় করতে পারে । (যেমন: পেয়ালা ও চামচ) । . নতুন কোন খেলনা দিলে সেগুলো তিন বা চারটি খেলনার সঙ্গে গুছিয়ে রাখা ।	. পাঁচটি বা তার বেশি বস্তুও নাম বলা । . বস্তু আসল জায়গায় ব্যবহার করতে পারা (যেমন: শলা বা কাঠি ঝাড়ুতে ব্যবহার করা) . কোন বস্তুও সাথে তার ছবি মেলাতে পারা । . ছকে মিলানো ছক বসাতে পারা । . পশুপাখির শব্দ মিলাতে পারা । . ছয় থেকে সাতটি বুক একত্রিত করা ।
যোগাযোগ স্থাপন	. জোরে শব্দ হলে চমকে যাওয়া । . ক্ষুধা পেলে ও অস্বস্তি বোধ করলে কাঁদা । . গলার শব্দ শুনলে ঘুরে তাকানো । . কান্না করে গোলমাল করা । . অবসন্ন,ক্ষুধা ও ব্যথায় ভিন্ন রকম ভাবে কান্না করা । . রক্ষনাবেক্ষনকারীর সঙ্গে শব্দ করা ।	. জোরে হাসা । . নাম ধরে ডাকলে কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া । . আনন্দ বা বেদনা শব্দ করে প্রকাশ করা । . শব্দ নকল করা । . কথা বলার সময় শব্দ করা ।	. যথাযথ সংকেতে সাড়া প্রদাণ করা যেমন :দাঁড়াতে বললে দাঁড়ানো,বিদায় সম্ভাষণ অথবা অন্যান্য নিত্যকর্ম । . সংগতিপূর্ণ দুই বা তিনটি শব্দ তৈরি করা । . গানের সঙ্গে অংগভঙ্গি করা । . বাবা-মা বা রক্ষনাবেক্ষণ কারীর সাথে কিছু শব্দ আদানপ্রদান করা । . শব্দ আওড়ানো বা বিভিন্ন ধরনের স্বরভঙ্গি করা	. ছোট নির্দেশ মেনে চলা যেমন : বাবাকে বলটি দাও . কোন প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া । . পাঁচ বা তার অধিক মানুষ,পশু-পাখি অথবা খেলনা চিনতে পারা । . স্বতস্ফূত ভাবে পরিচিত জনকে সম্ভাষণ বা বিদায় দেওয়া । . যখন "না "বলা হয় তখন কর্মকান্ড বন্ধ করে দেওয়া ।	. কোন জিনিসের বদলে অন্য কোন জিনিস রাখা বা বাহির করার নির্দেশ মেনে চলা । . কিছু পান করার জন্য কিছু বলা ,শব্দ করা বা ইঙ্গিত দেওয়া । . সর্বোচ্চ পাঁচটি শব্দ ব্যবহার করা । . শরীরের তিনটি অঙ্গ চিহ্নিত করতে পারা । . হাঁ বা না সূচকে প্রশ্নের উত্তরে সাড়া দেওয়া	. টিভিতে বা ছবিতে পরিচিত চরিত্র দেখে নাম বলতে পারা । . দুই শব্দের লাইন ব্যবহার করতে পারা (যেমন:আরো দুধ দাও) . পনের বা তার অধিক কোন বস্তুও চিহ্নিত করতে পারা । . দুইজন খেলারসাথীর নামসহ জানা । . শরীরের ছয়টি অঙ্গ চিহ্নিত করতে পারা ।
সামাজিক আত্মপ্রকাশ	. বড়দের দিকে তাকানো । . হাসি ও শব্দের মাধ্যমে অন্যের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করা । . পরিচিত ব্যক্তি বা বস্তু চিনতে পারা । . স্বস্তিতে থাকলে ,কোলে নিলে বা কথা বললে কান্না থামিয়ে দেওয়া । . রাগ হলে ,উত্তেজনা ও খিদে পেলে অনুভূতি প্রকাশ করা ।	. স্বস্তিতে থাকা । (যেমন: হাত ও বুড়ো আঙ্গুল চোষা) . কোলে নেবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করা । . আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে হাসা বা মাথা চাপড়ানো । . পরিচিত বা আপরিচিত কাউকে দেখে আলাদা বহি: প্রকাশ দেখানো । . সামাজিক যোগাযোগ শুরু করা ।	. পরিচিত জনের কাছে কোলে উঠার জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়া । . নির্দিষ্ট খেলনা, কাজকর্ম বা স্থান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দের অগ্রাধিকার দেওয়া । . সহজ খেলা খেলতে পারা যেমন : উর্কি মারা . বড় এবং ছোটদের ভিন্নভাবে সাড়া দেওয়া ।	. চেহারার অভিব্যক্তি,অভিনয় বা শব্দ অনুকরণ করা । . যদি কারো কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পায় তাহলে একই কাজ পুনরাবত্তি করা । . রক্ষনাবেক্ষণকারীর সংগে খেলনা শেয়ার করা . সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দুই বা তিনজন শিশুর সংগে ভালভাবে খেলা । . স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পুরু আবরনী বা নরম খেলনা ব্যবহার করা ।	. রক্ষনাবেক্ষণকারী ছাড়া অন্য কোথাও পরিচিত জায়গায় বসালে কান্না না করা । . অস্বস্তি বোধ করলে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার প্রয়াস করা । . সাহায্য ছাড়া অনেক কিছুই করতে চাওয়া । . সহজ কিছু বানালে উপভোগ করা । . নতুন কোন অবস্থার সমুখখীন হলে ভরসার দৃষ্টিতে রক্ষণাবেক্ষণকারীর দিকে তাকানো ।	. নিজের কাজে গর্ব বোধ করা । . টিভিতে বা সিনেমা,গান বা গল্প সান্ত ভাবে শোনা । . পরিচিত গান গাইতে পারে । . প্রয়োজনবোধে ধন্যবাদ দিতে পারে । . যখন সমস্যায় পড়ে সাহায্যের জন্য সহাযতা চায় ।
অভিযোজন ক্ষমতা/ধারন ক্ষমতা	. নিপল চোষার সময় শক্ত করে ধরে রাখা । . তরল খাবার গিলতে কোন্ ধরনের সমস্যা না হওয়া । . গোসল উপভোগ করা । . দৈনিক ৪ থেকে ১০ ঘন্টা ঘুমানো ।	. খাবার গিলে খাওয়া । . পছন্দ বা অপছন্দের খাবার দেখানো । . হাত ও বুড়ো আঙ্গুল চোষা । . মুখের ভিতর খাবার নড়াচড়া করার জন্য জিহবার ব্যবহার করা । . গিলার সময় মুখ বন্ধ করা ।	. চামচ দিয়ে খাবার সময় ঠোঁট বন্ধ করা । . রাতে ঘুমানো । . বোতল থেকে কিছু পান করার সময় বোতল ধরা । . ইচ্ছাকৃতভাবে মোজা টেনে খোলা । . আঙ্গুল দিয়ে খাবার তুলে খাওয়া ।	. উপযোগী খাবার চোষা । . নিজেই চুষনিযুক্ত পেয়ালা থেকে পান করতে পারা । . জামা কাপড় পড়া এবং খোলার সময় সহায়তা করা । . খোলা কাপ বা গ্লাস থেকে বড়দের সহায়তায় কিছু পান করা । . হাত ধোঁয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করা ।	. চামচ নড়াচড়া করা । . যখন ডায়পার পরিবর্তন করার সময় আসে হৈ চৈ করা । . গৃহস্থালীর সাধারন কাজে সহাযতা করা । . হাত ও মুখ নিজে ধোঁয়ার চেষ্টা করা ।	. ঢিলা কাপড় যেমন জেকেট বা শার্ট কারো সাহায্য ছাড়া খুলতে পারা । . দরজা খোলার জন্য হাতল ব্যবহার করা । . সাধারন কাপড়চোপড় নিজেই পড়তে পারা । . নিজেই চামচ ব্যবহার করতে পারা । . পরিচিত বস্তু সরিয়ে রাখা ।
শারীরিক ক্ষমতা	. উপুড় হয়ে যাওয়া ,পায়ের উপর সামান্য ভার বহন করা । . পাশ ফিরে শুলে হাত দুটি একত্রিত করা । . যখন পেটের উপর শোয় কিছু সময়ের জন্য মাথা তোলে । . কোন জায়গা থেকে বস্তুর অবস্থানে পৌছানো বা ধরতে চাওয়া । . এক সময় ছোট কোন বস্তু এক হাত দিয়ে ধরতে পারা । . গড়িয়ে চিত থেকে পাশ হতে পারে ।	. কোন বস্তু এক হাত থেকে আরেক হাতে নিতে পারে . দুটি বস্তু একত্রে নিতে পারে । . পাঁচ সেকেন্ডের মত বসে থাকতে পারে । . কোন জায়গা থেকে বস্তুর অবস্থানে পৌছানো বা ধরতে চাওয়া . গড়িয়ে চিত্ থেকে উপুড় হতে পারে . গড়িয়ে পার্শ্ব থেকে চিত হতে পারে।	. আসবাবপত্রের কিনার ধরে হাটতে পারা । . ছোট কোন বস্তু বুড়ো ও অন্যান্য আঙ্গুল ব্যবহার করে তুলা । . পেটের উপর হাত রেখে নড়াচড়া করা । . তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে কোন কিছু দেখানো । . কিছু ধরে একা দাড়ানো । . কারো সাহায্য ছাড়া ঘুরে বসা ।	. স্বত:স্ফূর্ত ভাবে কাগজে আঁকাআঁকি করা । . কারো সহায়তা নিয়ে দুই বা তিন পা ফেলতে পারা । . নিজের স্বাচ্ছন্দ্য কায়দায় রং বা পেন্সিল ধরা (বড়দের মত নয়) . স্বাচ্ছন্দ্যে বসা বা উঠার ক্ষেত্রে সমণয় বজায় রাখা । . নিজস্ব নিয়ন্ত্রন বজায় রেখে হাঁটতে পারে বা হাঁটা থামাতেও পারে	. বেশিরভাগ কাজ করার ক্ষেত্রে এক হাত ব্যবহার করা । . নিজের ভারসাম্য বজায় রেখে উবো থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারা । . হামাগুড়ি দিয়ে নিচে নামা । . নিচু খেলনার সরঞ্জামাদির উপরে চড়া । . আঁকাআর্কির সময় কাগজ হাত দিয়ে চেপে ধরা ।	. পিছন হয়ে হাটতে পারা । . গোলাকার,আনুভূমিক বা উল্লম্বভাবে ঘুরা, অনুকরণ করা । . সঠিকভাবে মাথার উপর বল নিক্ষেপ করতে পারা । . আঁকার সময় গোলাকার,আনুভূমিক বা উল্লম্ব ভাবে ঘুরতে পারা । . পা অদলবদল করে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারা ।